ভাসামানিকের ভালবাসা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ
রণধীর পাল
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
এম. এম. প্রিণ্টার্স
৩৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

মেলট্রেন নানা স্টেশন ছুঁয়ে যায়। দাঁড়ায় গুটি কয়েক স্টেশনে। তার গায়ে লেগে থাকে নানা জায়গার স্মৃতি। দাগ পড়ে সামান্য জায়গার। দু'দণ্ড জিরোবার মত সময় তো তার নেই। নিজের জীবনটাও তাই লাগে নিখিলের। জন্মে ইস্তক এত স্টেশন সে ছুঁয়ে গেছে—দাঁড়িয়েছে মাত্র দু'চার জায়গায়। তার গায়ে স্মৃতি নানা জায়গার। দাগ পড়েছে সামান্য ক'জায়গার। কোথাও জিরোবার মত সময় পায়নি সে।

পৃথিবীতে হরদম কত কী হয়ে যাচ্ছে। চিরকালই যেমন হয়। তার ভেতর আলাদা করে নিখিলের জন্য ঘটনা ঘটার কোন ভিন্ন দুনিয়া নেই। এখানেই সে নানাভাবে ছবি দেখে আসছে। সেসব ছবির অনেকগুলোই এখন অস্পষ্ট।

রায়পুরে বাবা রেলের গুদামবাবু। মায়ের কোলে বসে নিখিল ছবি দেখল সবার সঙ্গে—রামরাজ্য, ভরত মিলাপ। রেলকোয়ার্টারের মাঠে। তখন বিকেলে দুধ খেয়ে নিখিল চাকরের সঙ্গে বেড়াতে যেতো। বম্বে মেল, হাবড়া মেল বাঁশী শুনে সবাই বুঝতে পারে। নিখিল তখন সবার চোখে গুদামবাবু কা ছোট লওণ্ডা। লম্বা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঘন্টাটা ভাল করে দেখে বাড়ি ফেরা হোত রোজ সন্ধ্যেবেলা। তখন বারিপদার বাস হর্ন দিয়ে ছাড়ে।

নিখিলের এখনো মনে পড়ে—তখন সেই বয়সী একটা নেপালী মেয়ে—নাম ছিল ভানু—তার খুব বন্ধু ছিল। পরে বড় হয়ে বুঝতে পেরেছে ভানুর বাবা ছিল রেলের নাইটগার্ড।

ভানুকে একদিন না দেখলে ভাল লাগত না নিখিলের। সে ভানুর ওপর খুব অত্যাচার করতো। ওইটুকু মেয়ে মুখ বুজে সে

অত্যাচার সহ্য করতো। গম্ভীর গোল মুখে দুটি ছোট ছোট চোখ। লাল ওলটানো ঠোঁট। চাপা নাক। মাথায় জোড়া বেণী। ভানুও খুব ভালবাসতো নিখিলকে। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি যাবার সময় হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতো। ভানুর বাবা হাসতে হাসতে মেয়েকে কাঁধে তুলে নিত।

এসব যেন কোন অসম্পূর্ণ ছায়াছবির খোলা রিল। যেখান থেকে সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছে নিখিল।

খুব ছোটবেলায় স্মৃতির ভেতর সিনেমার স্বপ্নের কুয়াশা ফাঁকা পেলেই ঢুকে পড়ে। তাতে চেনা জিনিসও আবছা হয়ে যায়। কিছুতেই মনে পড়তে চায় না। রায়পুর মানেই সিমেণ্ট কলের মিহিধুলো, আদিবাসী মেয়ে পুরুষের জটলা, শালগাছ আর নীল ধোঁয়া ছাড়া বর্ষায় ভেজা মেল ট্রেনের ইঞ্জিন। জানলায় দাঁড়িয়ে রোজ গাড়ি চলে যাওয়া দেখতে পাওয়া মানেই রোজ একটা করে দুঃখকে মনে রাখা। কত চেনা জানা মানুষ নিয়ে ট্রেনের মত একটা সুন্দর অজগর কতদূরে চলে গেল। রোজ চলে যায়। আর আসে না। লেজে ফুটে থাকে একটা লাল আলোর ফুটকি। তাও শেষে মিলিয়ে যায়।

এখান থেকেই নিখিলের মনে থাকা পৃথিবীর ভিত্। এখানকার আলো, কোলাহল, ধুলো ভাঙা হাসি, আবদার সবই দুনিয়ার প্রথম ইতিহাসের পুরাবস্তু।

এইসময় একদিন ট্রেন থেকে স্টেশনে এসে নামলো বড়দি আর জামাইবাবু। পাঁচ ছ বছরের ছোট শালা নিখিলকে জামাইবাবু কোলে তুলে নিল। আদর করল। পাকানো গোঁফ। ভারি হাসি। বড়দি ওয়ালটেয়ার থেকে আসার সময় তার জন্যে সমুদ্রের শঙ্খ, ঝিনুক এনেছে। জামাইবাবু সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সবাইকে বাঁশী বাজিয়ে শোনালো। আড় বাঁশী। তা ধরার কায়দাই আলাদা। যেমন লম্বা মানুষটা—তেমন লম্বা তার বাঁশী।

দিদি জামাইবাবু দিন কুড়ি ছিল। বিকেলে স্টেশনে বেড়াতে যাওয়া হোত। ফেরার পথে রেলের পাঁউরুটি কিনে ফেরা, রাতে দুধে ভিজিয়ে খাওয়া। জামাইবাবুর সঙ্গে।

দিদি জামাইবাবু ফিরে যাবার দিন নিখিল মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদলো।

বড়দি বলল, 'দাও ওকে। নিয়ে যাই সঙ্গে। আমাদের তো ছেলেপেলে নেই।

জামাইবাবু বলল, 'শালাবাবুকে দত্তক নাও। ঘরবাড়ি আর ফাঁকা লাগবে না তাহলে।'

মা বলল, 'নিয়ে যাও দিচ্ছি। কিন্তু ফেরৎ দেবে। আমি পেটের ছেলে কাউকে দিতে পারবো না।'

বড়দি বলল, 'নে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে।

সে কি আনন্দ। ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে দিদির কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল নিখিল। ওয়ালটেয়ারে পেঁছে কী আদর। রোজ জামাইবাবু অফিস থেকে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

তাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িটা সমুদ্রের শান্ত বালির ওপর দিয়ে ঘুরে ঢেউ দেখাতে দেখাতে তবে অফিসে নিয়ে যেত। কিছুদিন পরে জামাইবাবু তাকে অফিসের একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে রায়পুরে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। ট্রেনে তুলে দেবার সময় একটা আড়বাঁশী শালাকে দিয়ে দেন। ফাঁক পেলে বাজিও—

খানিকটা খানিকটা বাজাতে শেখে নিখিল। রায়পুর ওয়াল-টেয়ার মিলিয়ে ও কটা দিন নিখিল আনন্দের পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে ভেসে বেড়িয়েছিল।

রায়পুর ফিরেই খবর পেল, ভানুর খুব জ্বর। ছাড়ছে না। একদিন গিয়ে দেখে এল। জ্বরে অচৈতন্য। তাকে দেখে ঠোঁট একটু কাঁপলো মাত্র। পরের স্টেশন দুর্গের একদল বনবাসী ট্রেনে

করে কোথায় গিয়েছিল। তাদের মেয়েরা পায়ের মল বাজিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এল। চলেও গেল। তারপরই খবর এল, ভানু আর নেই। শেষ দেখা সে আর ভানুকে দেখেনি। মৃত্যু ব্যাপারটাকে তার চিরকালই শরীরের ভেতর একরকমের সিঁধেল চোর বলে মনে হয়। জীবন থেকে সব আনন্দ সেই যে চুরি হয়ে গেল। বিশেষ করে রায়পুরে।

তখন নিখিল বড় হচ্ছিল। ওয়ালটেয়ার থেকে বড়দির চিঠি এল মায়ের কাছে। তোমার জামাইয়ের সমুদ্রে ডিউটি পড়েছে। আমি সারাদিন এতবড় বাড়িতে থাকি। আর কেউ নেই। নিখিল থাকলে এত খালি লাগতো না। এক একদিন তোমার জামাই ঘরে ফিরে বাঁশী নিয়ে বসে। কোত্থেকে যে সময় চলে যায়। নিখিল কি আমাদের কথা বলে? যুদ্ধ এসে গেল মা—

মা বড়দির চিঠি এমন সুর করে রিডিং পড়তো—যা সবটাই সেই কাঁচা বয়সে মুখস্ত হয়ে যেত নিখিলের।

যুদ্ধ রায়পুরেও এসে গেল। স্টেশনের আলোগুলোর মুখে কালো পোচ্ পড়ল। এ যেন খেলা খেলা করে মৃত্যুর অপেক্ষা। সোলজার ভর্তি ট্রেন পাশ করতে দেখে নিখিল।

এইসময় ক্যানসার হয়ে বড়দি শেষ সময়ে মরতে এল। সে কষ্ট দেখা যায় না। এরই ভেতর বড়দি শুয়ে শুয়ে নিখিলকে আলাদা ঘরে আদর করতো। ছোড়দি আর বড়দাও নিখিলের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। তারা কলকাতায় দাদুর-ওখানে থেকে পড়ে। বাবা মাসে মাসে টাকা পাঠায়। বড়দার চিঠি আসে—জাপানী বোমার ভয়ে সবাই শহর ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। আমরা কি করিব?

বাবা লিখে পাঠালেন, তোমরা থাকো। মন দিয়া পড়াশুনা কর। ইংরাজরা জিতিবে।

ইংরাজের গর্বে গর্বিত বাবা নিখিলদের গড সেভ দ্য কিং গানটা শেখায়। রাজার জন্মদিনও বোধহয় রায়পুরের রেল কোয়ার্টারে

হোত। বড়দি একদিন চলে গেল। চিঠি পেয়ে ছুটে এসে জামাইবাবুর সে কি কান্না।

তারপরই বাবা চলে গেল। অদ্ভুতভাবে। বড়দির মৃত্যুর পর বাবা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ওভার কনফিডেন্ট বাবা একদিন রায়পুর ইয়ার্ডের চেনা লাইনে শটকাট করতে গিয়ে অন্যমনস্ক অবস্থায় গুডস ট্রেনে কাটা পড়ল।

তখন যুদ্ধ শেষ। রায়পুরের পাট চুকলো। রায়পুর চিরকালের মত উঠে গেল সুখস্মৃতির পাতায়। নিখিলরা খসে পড়ল পৃথিবীর ধুলোয়। রায়পুর থেকে চলে আসার সময় রেল কোয়ার্টারের দেওয়ালে বড়দির অল্প বয়সের একটা ছবি ফেলে যায়। বড় ভাবনা হয়—পরের রেল এমপ্লয়ি ও কোয়ার্টারে এসে ছবি খানার কি করবে? ফেলে দেবে? না, রেখে দেবে? জামাইবাবু তখনো ওয়ালটেয়ারে। ওদের চলে আসার কিছুদিন আগে অফিসের কাজ নিয়ে একবার এসেছিল কিছুক্ষণের জন্য। এই এক বেলা। যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ নিখিলকে দেখছিলেন। ভারি গোঁফ। লম্বা মানুষ। আড় বাঁশিতে দারুণ দম। বড়দি বেঁচে থাকতে নিখিলকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। ওয়ালটেয়ারে থাকতে অফিস থেকে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন নিখিলের জন্যে। নিখিল তো তখন বালক মাত্র।

॥ দুই ॥

দাদু মানে ঠাকুর্দা। নিখিলের বাবাই প্রথম চাকরি করতে বাড়ির বাইরে বেরোন। নিখিলের ঠাকুর্দা বিশেষ কিছু করতেন না। বর্ধমানে দেশের বাড়িতে ওকালতনামা দেওয়া ছিল। সেখান থেকে জমি বিক্রির টাকা ভবানীপুরের বসতবাড়িতে যেত। সেই টাকায় সুখে সৌখীনতায় চলে যেত ঠাকুর্দার। ঠাকুমা অনেকদিন

হল গত। আর রায়পুর থেকে পাঠানো পড়ার খরচ থেকেও ঠাকুর্দার আফিম আসতো। বড়দা ঠাকুর্দার ন্যাওটা ছিল। তার হাত ধরে নানান্ সভা-গানবাজনায় যেতো।

নিখিল আর ওর ছোড়দিকে নিয়ে ওদের মা সুবারবান রোয়ের বাড়িটায় এসে যখন উঠলো—তখনো ভবানীপুরের প্রায় বাড়িতেই পাতাবাহার, মাধবীলতা। কারও উঠোনে বা একটা বকুলগাছ। বাড়ির সামনে খানিকটা খোলা চাতাল। নিখিল এসে রামরতনের ক্লাশ ফাইভে ভর্তি হলো। বড়দা ততদিনে হাতগুটিয়ে ফুলশার্ট পরে। ধুতি মালকোছা করে। দাড়ি রাখে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ধরেছে।

মাস কয়েকের ভেতর নিখিলের ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। এফ এল এম এস ডাক্তারের সঙ্গে। বিয়েও হল—মায়ের হাতের পুঁজিও ফুরলো। থাকলো কিছু ডাকঘর আর কোম্পানির কাগজ।

দাদু একদিন বিকেলে নিখিলের মাকে বলল, বউমা তোর হাতের একটা বালা হবে?

কেন বাবা?

বেচে দিয়ে কচুড়ি খেয়ে আসতুম!

মা সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির আঁচলে হাত ঢেকে ফেলে। নিখিলের মনে আছে। এরপর সংসার চলছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বড়দা মাপা টাকা দেয়। মায়ের হিসেব থাকে না। ধমক খায় বড়দার কাছে। দাদু আবার তার ভেতর থেকে এটা সেটার জন্য পয়সা চেয়ে নেয়। কখনো আফিম। কখনো কচুড়ি। কখনো আরও কিছু।

এইসময় রিটায়ার নিয়ে বড় জামাইবাবু এসে চেতলায় বাসা নিলেন। বাঁশী বাজান। একা থাকেন। নিখিল গেলে ঝিকে দিয়ে পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে কাছে বসিয়ে খাওয়ান। নিখিলও বুঝতে পারতো—তাকে খাইয়ে বড় জামাইবাবু তার ভেতর দিয়ে বড়দির ভাবটা ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। কিংবা পাচ্ছেন না।

নিখিল যখন সেভেনে তখন একদিন গভীর রাতে ছোড়দি ছুটে এল। মা দশ হাজার টাকা হবে? তোমার জামাইয়ের বড় বিপদ।

মা হেসে ফেলল। অত টাকা কোত্থেকে আসবে?

দাদুর কাছে?

তোর দাদু তো আফিম খেয়ে ঘুমোচ্ছে। কানাকানি শুনছি—তলায় তলায় এ বাড়িটা নাকি বন্দক দিয়ে বসে আছেন। শেষ কাপতেনি সেই পয়সায়—

ছোড়দি বলল, তাহলে বড় জামাইবাবুর কাছে চল।

সেই রাতে পায়ে হেঁটে জামাইবাবুর বাড়ি যাওয়া হল। চেতলায়। ঘুমোচ্ছিলেন। ছোড়দিকে দেখে ঠাট্টা করলেন। নিখিলের মাকে করলেন প্রণাম। সব শুনে ছোট শালীকে বললেন, কাল বেলা বারোটায় আসিস। ব্যাংক থেকে তুলে রাখবো।

এখন হয় না টাকাটা?

ঘরে কি কেউ অত টাকা রাখে? কাকে দিতে হবে?

ছোড়দি বলল, বিরাট একটা ভুল হয়ে গেছে। চাপা দিতে পুলিশকে দিতে হবে।

বড় জামাইবাবু জানতে চাইলেন, এমন কি ভুল যে পুলিশকে রাতারাতি অতগুলো টাকা দিতে হচ্ছে?

ছোড়দি কোন কথা বলতে পারলো না। চুপ করে কাঁদতে লাগল।

বড় জামাইবাবু বললেন, থাক—বলতে হবে না। বুঝেছি।

বড়দা পাকুড় গিয়েছিল। তখন স্টোনচিপের অর্ডার ধরছে। ফিরে এসে বলল, বড় জামাইবাবুর টাকা শোধ হবে কি করে?

মা বলল, কেন? তোমার কোম্পানির কাগজ-ডাকঘরের সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে সব শোধ করে দেব।

ওতে হাত দিও না মা। ধার করেছে ছোট জামাইবাবু। শুধবেও ছোটজামাইবাবু।

ছোট জামাইবাবু কোনদিন শোধ করেছিল কিনা নিখিল জানতে পারে নি। শুধু দেখতো ছোট জামাইবাবু খুব পড়ছে। তারপর দেখা গেল একদিন এল এম এফ থেকে এম বি বি এস হয়ে গেছেন। পসার বাড়ছে। একখানা ছোট একতলাও বানিয়েছেন।

দাদু চলে যেতে বাড়িটা হাত বদল হত। মা বলে কয়ে বছর খানেক থাকার কড়ার করে নিল। সেই ফাঁকে বাবার কাগজপত্র ভাঙিয়ে একটা ভাঙা বাড়ি কিনে ফেলল। মায়ের সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উঠলো নিখিল। তখন সে কলেজে ঢুকেছে। জীবনটা শুরু হয়েছিল সুন্দর ছবির মত। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে—ততই কি হয়ে যাচ্ছে জীবন।

মা থাকতেই বড়দা বাড়ি ভেঙে নতুন করতে লাগল। তার ভেতর মা টিকল না। তখন বড়দার কিছু পয়সা হয়েছে। গুরু-ভাই হয়েছে ক'জন। তারা সন্ধ্যেবেলা একত্র হয়ে ওই আধ সারানো বাড়িতে গুরুনাম গায়। বড়দা একদিন এর ভেতর বলল, নিখিল আমি বলি কি তুই অন্য কোথাও থাক। আমি তো স্রেফ নিরিমিষ্যি খাই—

এইবার নতুন জীবন শুরু হল নিখিলের।

ঃ তিন ॥

গোবিন্দ আঢ্য রোডের বস্তিতে দু'টো টিউশুনি নেওয়া ছিল নিখিলের। আর একটা নেওয়া হল। চক্রবেড়িয়া রোডে ঘোড়ার আস্তার ওখানটায় এক মেস বাড়িতে থাকা খাওয়ার জায়গাও পেল। রুমমেট পেল এক ডিভোর্সিকে। গোলগাল চেহারা। তার সঙ্গে গল্পই হয়—পড়াশুনা আর হয় না।

সেই মোহনদার পরামর্শে পাঁচ টাকার চালান জমা করে অ্যাপলিকেশন দিল পি ডবলু ডি-তে। ক'দিন পরে মোহনদা

লোকটাকে ভাল লাগল না। উনিশ বছর বয়সে মেসে সেই প্রথম নিখিলের জীবন।

মেস হলেও জীবনে যেন একরকমের মুক্তি এল নিখিলের। এখানে কোন মা বাবার সম্পর্ক নেই। খাবারটা রেডি হলে খেয়ে নাও। ঝাড়া হাত পা। নিজের বিছানায় এসে শুয়ে থাকো যতক্ষণ ইচ্ছে। খারাপ লাগলো তো দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ো। সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। চলন্ত মানুষজন, গাড়িঘোড়া চোখ ভরে দেকে যাও। এ কি কম স্বাধীনতা। মায়ের বারণ নেই। দাদার চুপচাপের গুমোট নেই। নিখিলের মনটা নতুন স্বাধীনতায় সরল হয়ে উঠলো।

কিন্তু মোহনদা লোকটা বড় জ্বালায়। নিখিলের গোনাগুনতি টাকা পায়সা। তার ভেতর থেকে ধার চায় মানে ফেরতের নাম নেই। তারপর বকবক করা চাই। নিজের খরচ চালিয়ে নিজের একা একা থাকা নিখিলের এই প্রথম। সেই সুখের ভেতর কাঁটা হয়ে গেঁথে আছে মোহনদা।

গাঁজা পার্কের কাছে কলেজের বন্ধু অভিরূপের সঙ্গে দেখা। কলেজ যাচ্ছিস না কেন?

এড়িয়ে যেতে চাইল নিখিল। অভিরূপ হল গিয়ে ভবানী-পুরের যাকে বলে ভাতওয়ালা বাড়ির ছেলে। মানে খাওয়া দাওয়ার চিন্তা নেই। বাবার ওকালতির বিরাট চেম্বার একতলায়। আর সে? ভেসে ভেসে বেড়ানো পাখি! যার পড়াশুনোয় এর ভেতরেই ঢেড়া পড়ে গেছে।

কী জানি কেন মাত্র ক'দিনের ক্লাশে এই ছেলেটিকে ভাল লেগে যায় অভিরূপের। তুই আমাদের বাড়ি থেকে পড়তে পারিস—

টার্ফ রোডে অভিরূপদের বাড়ি। নিজেদের গাড়ি। নিজেদের গ্রে হাউন্ড কুকুর। তারপরও অভিরূপের মা ভীষণ যত্ন করতে লাগল নিখিলকে। আহারে! মা মরা ছেলে। একা থাকে—

নিখিলের দম বন্ধ হয়ে এল। সে বুঝতে পেরেছে—তার এখন পড়া চালানো সম্ভব নয় বরং টিউশনি করা দরকার মন দিয়ে। তাতে একটা স্বাধীনতা আসে। কারও স্নেহের পাত্র হয়ে থাকতে হয় না। স্নেহের সঙ্গে একটা বাঁধনও থাকে।

অভিরূপের বাড়ি থেকে নিখিল পালালো। ঠিক করল ভবানীপুর এলাকাই ছেড়ে দেবে। এ পৃথিবীতে তার আপনার বলতে কেউ নেই। ছোড়দির ওখানে একদিন গিয়েছিল। জামাইবাবু পসার নিয়ে ডুবে আছে। কে এল-কে গেল-দেখার সময় নেই তার। একতলাটা এতদিনে বোধহয় দোতলা হল।

শোনা কথা বড়দা যেন কোন্ গুরুভগ্নীর মেয়েকে বিয়ে করবে। বাকি থাকল বড় জামাইবাবু। ঘুরতে ঘুরতে তার কাছে চেতলায় গিয়ে হাজির হল নিখিল।

সব্জিবাগান লেন থেকে বেরিয়ে পাশেই মাঠকোঠা বাড়ি। সকালবেলা বড় জামাইবাবু বাঁশী নিয়ে বসেছিলেন। এখন কম দেখেন। নিখিলকে খানিক্ষণ যাকে বলে পর্যবেক্ষণ করে শেষে বললেন, শালাবাবু যে? কোত্থেকে? কিছু খাওয়া দাওয়া হয়েছে।

খেয়ে বেরিয়েছি। —বলে নিখিল জামাইবাবুর কাছাকাছি তক্তপোষে বসলো। তারপর বলল, কী রাগের তোড়জোড় চলছিল? আমি এসে সুর কেটে দিলাম—

না না। মালকোষ। বোসো। শুনবে?

আজকাল দমে কুলোয়?

কষ্ট হয়। ফিরে ফিরে বাজাতে পারি নে। শোন। —বলে প্রায় আধ ঘণ্টা খানেক চোখ বুজে বাঁশীতে ফু দিয়ে চললেন। সেই সঙ্গে চললো—ফুটোয় ফুটোয় আঙুল। গোঁফ পেকে সাদা। বড় বুকখানা দমের জন্যে ওঠানামা করছিল।

উঠে আসবার সময় নিখিলের মনে হচ্ছিল যেন রোজই দোবেলা

দেখা হয় বড় জামাইবাবুর সঙ্গে। জানতে চাইল, নিজের কাজকর্ম করতে পারেন?

কম্ম তো চাল ফোটানো। ঘর ঝাঁট—যা একটি মেয়ে করে দিয়ে যায়।

অভিরূপদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসার পর পাকা ঠিকানা বলতে টিউশনিগুলো। পি ডবলু ডি—চাকরির অ্যাপলিকেশনে এদেরই একজনের ঠিকানা দিয়েছিল নিখিল। সেখানে এল ইণ্টারভিউয়ের চিঠি। গোপালনগরে সেচভবনে গিয়ে ইণ্টাভিউ দিতে হবে।

কোন পাকা ঠিকানা নেই নিখিলের। একটা পাকানো বেডিং বগলে। ইস্ত্রি করা এক প্রস্থ প্যাণ্ট শার্ট। ব্যস। এই অবস্থায় সে ইণ্টারভিউ দিতে গেল। সেচভবনের সামনে সরকারী পুকুরে লোকে টিকিট কেটে মাছ ধরছে। এ দৃশ্যও তখন তার ভাল লাগল। মনে হল—না জানি কী একটা ভাল কিছু ঘটে যাবে। দুঃসময় কেটে যাচ্ছে।

পরীক্ষা ভালই হল। টিউশনি করতেই একদিন চাকরির চিঠিও এসে গেল। উত্তর কলকাতায় রিজিওন অফিসে ডিলিং অ্যাসিস্টাণ্ট। চাকরি যে এত মধুর তা জানা ছিল না নিখিলের। আলাদা টেবিল চেয়ার। মাস গেলে মাইনে। জল খাবার আলাদা গ্লাস। ততদিনে নিখিল মির্জাপুরে মেসপাড়ায় উঠে এসেছে। অফিসের পর রুমমেটদের সঙ্গে তাস খেলে খেলার ভঙ্গী এমনই যেন জন্ম থেকেই খেলে আসছে—বড়ও হয়েছে মেসে থেকে থেকে।

মাস তিনেকের মাথায় অফিসে কচিবাবুর ওপর বদলির অর্ডার এল! এ ক'মাসে নিখিল সবার কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। সে ভাবতেও শুরু করেছে—প্রাইভেটে ফের পড়াশুনো শুরু করে দেবে। কচিবাবু আর তার বউ নিয়ে পরিবার। একটি ছেলে ছিল—জলে ডুবে মারা যায়। কচিবাবু নিখিলকে ধরলো, তুমি তো ভাই একা

মানুষ। যাওনা তিন বছরের জন্যে শিলিগুড়ি। তাহলে তোমার বউদি আর আমি চাকরির শেষ দিকটা কলকাতায় কাটাতে পারি। স্বার্থপরের মত শোনাচ্ছে—কিন্তু ত্যাগ স্বীকার করতে হলে এক তুমিই পার।

নিখিল বলল, এ আর এমন কি! আমার কাছে চাকরি করা নিয়ে কথা। দুর্গাপুর, অন্ডাল, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, কলকাতা —সবই আমার কাছে সমান। কাগজ দিন—কাকে লিখবো—

অফিসে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। নিখিলের মত মানুষ হয় না। সবার জন্যে ফিল করে। নয়তো কলকাতা ছেড়ে কে আপনা থেকে শিলিগুড়ি যেতে রাজি হয়ে অ্যাপ্লাই করে। তাও কম করে তিন তিনটে বছরের জন্যে। স্রেফ কলিগের সুবিধার জন্যে।

রায়পুর থেকে চলে আসার পর আবার বহুদিন পরে কলকাতা থেকে বাইরে যাওয়া। মিজাপুরের মেসটা বাড়ির মত হয়ে উঠেছিল। নিখিলের যেন একটা মায়া পড়ে যায়। একতলা দোকানঘর। দোতলা তেতলায় থাকা। চারতলায় খাওয়া দাওয়া। কেউ ওকালতি পড়ে-কেউ আবার ছোটখাটো অর্ডার সাপ্লাই করে। মাসে একদিন ফিস্ট হয়। ক্যারামবোর্ড আছে। আছে টি ভি। করিডরে বসানো। সন্ধ্যে হলেই খুলে দেওয়া হয়। খেতে বসলে ঠাকুর প্রথমের দিককার তুলে রাখা ঘন ডাল দেয় এক বাটি আলাদা করে।

শিলিগুড়ি পেঁছে নিখিলের এই মায়া কেটে গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে অফিসের থাকার জায়গা আশ্রম পাড়ার দোতলার জানলা দিয়ে বরফ ঢাকা পাহাড়ের মুড়ো দেখে চিনল—কাঞ্চনজঙ্ঘা। বাতাস কলকাতার চেয়ে পাতলা কিন্তু অনেক ধারালো। ধুলো কম। চা বাগানের দিকের রাস্তাগুলো একদম ছবি। অল্পদিনে মন বসে গেল নিখিলের।

পি ডবলু ডি-র খাটান হাতি কাঠ পোলের গড়িয়ে গড়িয়ে টেরাইয়ের দিককার শুখা নদীতে নিয়ে যায়। সেখানে রোড-কাম-

পোল হচ্ছে। তার হিসেব পত্তর রাখে নিখিল। আর খাওয়া দাওয়া করে মানু মাসির নেপালী মেসে। অফিসের কাছেই একটা গামা গাছের নিচে। খোলামেলা কাঠের বেঞ্চে থালা নিয়ে বসতে হয়। মানু মাসি তার কাঠের ঘরের উনুন থেকে গরম গরম ভাত বেড়ে আনে। শীতের সন্ধ্যায় রুটি করে। সঙ্গে কোয়াশের তরকারি।

কোত্থেকে চারটে বছর কেটে যায় শিলিগুড়িতে। ঘুম থেকে উঠলে চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দার্জিলিংয়ের লেবু। সুগন্ধী চা। আর মানু মাসির ভাইজি-পারিজাত ছেত্রী। গামা গাছের ছায়ায় পারিজাত সময়ে অসময়ে অফিসবাবুদের-বিশেষ করে মাস-কাবারী মেসবাবুদের চা করে দেয়। এ এক মোহ। পারিজাতের হাতের ধোঁয়া ওড়া চা। এক এক সময় অফিস করে মেসে গড়িয়ে-মানু মাসির মেসে চা উড়িয়ে মনে হত জীবনের শুরু থেকেই নিখিল এরকম করে আসছে।

ডায়না, সংকোচ জলা—এদিককার সব পাহাড়ি নদীর নাম। ভূটান পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। বর্ষার আগে তাদের গায়ে নানান জায়গায় বাঁধ বাঁধের টেন্ডার খোলা হত। আর অমনি খামের ছড়াছড়ি। নিখিলের নামেও উপরি টাকা খামে এসে হাজির হত। ঠিকাদাররা এমন ভক্তিভরে দিত যেন এ প্রণামী না নেওয়াও পাপ।

পকেটে মাইনে ছাড়া টাকা-চা বাগানের সুন্দর রাস্তা। পাশে পারিজাত ছেত্রী। মটরের ঝাঁকুনিতে তার গলার মালা দুলছে। ঠোঁটে চোখ ঠিকরানো হাসি। তার জন্যে সব ভূটিয়া উপহার কেনার প্রতিযোগিতা মেসবাসিদের ভেতর। সে এক রক্ত চনমন করা অভিজ্ঞতা। এখানেই নিখিল জুয়ো খেলা ধরে। আসলে পারিজাতের ফর্সা গোল মুখে কালো গম্ভীর চোখ-ওলটানো লাল ঠোঁট-দুই বেণীর ঝনাৎ ঝনাৎ চলাফেরা নিখিলকে রায়পুরের শিশু বয়সের সেই হারানো ভানুর কথা মনে করিয়ে দিত।

ভানু সেই ছোট্ট বয়সেই নিখিলকে ডেকেছিল বাবুজি।

পারিজাতও এই বড়বেলায় নিখিলকে ডাকে বাবুজি।

শুনে শুনে ভেতরে ভেতরে ভেসে বেড়ানো নিখিল শিউরে ওঠে।

॥ চার ॥

সরকারী পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট কর্মচারীদের মনের ইতিহাসের কোন ফাইল রাখে না। কোন এক সবন্ধ নিস্পৃহ নিয়মে নিখিল সাত দিনের নোটিশে তমলুকে গিয়ে জয়েন করার অর্ডার পেল। কোথায় শিলিগুড়ি আর কোথায় তমলুক।

পারিজাত ছেত্রীকে একশো একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিখিল ট্রেনে উঠলো। তমলুকে গিয়ে মেস পেল বর্গভীমার মন্দিরের কাছাকাছি। একতলা দোতলা সব বাড়ি। পানের বরজ। বিরাট নদীর খাত। কিন্তু অনেক নিচে সামান্য জল। নদীর পাড়েই মন্দির।

অফিস করে বিশেষ কোথাও যাবার নেই। অফিসের কিছু লোক মিলে এখানেও মেস। তবে এ মেসের বাসিন্দারা শনি, রবিবার বাড়ি চলে যায়। বাড়ি মানে কলকাতায়। সোমবার দুপুরে ফিরেই সুড়ুৎ করে অফিসে ঢুকে যায়।

সোম থেকে শক্রবার মেসে জোর তাসের আড্ডা বসে। তে তাসও হয়। কখনো নিখিল জেতে। কখনো হারে। বেশ একটা উত্তেজনায় সন্ধ্যেবেলাগুলো কাটে। শিলিগুড়ির কথা কিছুই মনে পড়ে না নিখিলের। সে যেন তমলুকের এই মেস বাড়িটায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে। মনে মনে হেসে নিজেকে মনের ভেতর শোনায় নিখিল-আমি হলাম গিয়ে ভাসামানিক। জুয়ো, মেলামেশা, তাসে বুক অব্দি ডুবে গেলেও-নাক অব্দি বুজে এলেও আমি ফাঁকা চরাচরে দিগন্তের নিচে এমনি একা।

অনেক পরে বিষ্ণুপুরে থাকতে দেখেছে—তমলুকেও দেখলো—রাত হলে মেসবাড়িতে মেয়েছেলেরা আসে। থাকে। চলে যায়। এটা বিশেষ করে শনি আর রবিবারের রাতে যারা থেকে যায়—তাদেরই রেওয়াজ।

ঠিক এইভাবেই কমলা নামে একটি মেয়ে এল তার ঘরে। সুবিধা হল না নিখিলের। কমলা চলে যেতে নিখিল নদীর পাড়ে গেল। নদীর বিরাট খালি বুকটা অন্ধকার কালোয় ভর্তি। সেদিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল রায়পুরের ভানুকে। শিলিগুড়ির পারিজাত ছেত্রীকে। দিনটা বোধহয় শনিবার ছিল। সন্ধ্যেরাতে ফাঁকা মেসে ফেরার পথে সে একটা পাইট নিয়ে ফিরলো। একা একা মদ খাওয়া যে কী যন্ত্রণার। সবটা পারল না। ঘুম এসে জাপটে ধরলো নিখিলকে।

অফিস যাওয়ার পথে নিখিল দেখে—গেরস্থ বাড়ির বরজে আকাশের রোদ ঢুকে পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে। বর্গভীমার মন্দির চাতালে হাঁড়িকাঠ বলির রক্তে লাল। বহু নিচে নদীর জলে কোথাকার গাঁথা মালা অবহেলায় ভেসে যায়। অফিসে পেঁছে মনটা কেমন উদাস লাগে। লাহিড়িদা একটু আধটু জ্যোতিষচর্চা করে। সে নিখিলকে দেখে বলল, তোমার তো বিবাহ আসন্ন—

সেই আশাতেই থাকি লাহিড়িদা!

বলেও মনে হল নিখিলের—কত লোকের তো বউ থাকে। আমার না হয় একজন হবে। তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে যে বউ হবে—সে আবার পরেও যদি সারা চরাচর জোড়া দিগন্তের নিচে নিজেকে এরকম একা লাগে নিখিলের—তখন কি হবে। একজন বেশ ফুরফুরে ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্টের জীবনে বউ কথাটায় প্রায় ফুল ফুটে ওঠে।

পরদিন ছিল শনিবার। সেদিন অফিসের পর নিখিলও কলকাতায় খেপ মেরে ছিল সবাই যেমন বাড়ি ফেরে প্রায় সেইভাবে

সে কলকাতায় ফিরলো। হাওড়া স্টেশন থেকে ভবানীপুরে এসে দাদার বাড়িটার কাছাকাছি গেল। যারা কিনেছে—তারা ভেঙেচুরে বাড়িটারই ভোল পালটে ফেলেছে। তখন মনে হল—শুধু শুধু কলকাতা ছুটে এলাম কেন?

ছোড়দির ওখানে যাবো? জামাইবাবু কেমন রিসিভ করবে কে জানে। বড জামাইবাবুকে ঘুম ভাঙিয়ে এখন তোলার কোন মানে হয় না।

শিলিগুড়ির মানুমাসির মেসের বিমল চাকলাদারের সঙ্গে দেখা। বলল চল একসঙ্গে কতদিন খাইনা।

খাওয়া হোল। বারে। বার থেকে বেরিয়ে বসুশ্রীর সামনে দুজনে ঘুরছে। নাইট শো হাউজফুল। দেখাই যাক না টিকিট পাওয়া যায় কি না। ব্ল্যাকে একজন দিচ্ছিল—বালকনি আট টাকা —ব্যালকনি আট টাকা—

নিখিল কিনতে যাবে—এমন সময় নীল শাড়ি পরা একটি মেয়েও হাত বাড়ালো। নিখিলের হাত লম্বা। টিকিটের গোছা সে ধরে ফেলল। ফেলে দেখল-- মেয়েটির মুখ চুন হয়ে গেছে। সঙ্গে আরও একটি মেয়ে।

কি মনে হতে নিখিল চারখানা টিকিট ব্ল্যাকে কিনলো। কিনে দু'খানা মেয়েটিকে এগিয়ে দিল।

কত?

পয়সা লাগবে না।

মেয়েটি হি হি করে সস্তার হাসি হেসে বলল, ষোলটা টাকা কম নয়। এই নিন।

টাকা দিয়ে টিকিট নিয়ে মেয়ে দুটি গরম ঘুগনির কাছে চলে গেল। তখন বারের নেশাটা ভাল করে নিখিল আর বিমল চাকলাদারের টুটি চেপে ধরল। অমনি ওরা দুজনও আহ্লাদে ঘুঘনির গরম চুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সাল পাতায় গরম গরম ঘুগনি অনেকদিন পরে খেতে মন্দ লাগল না। শিলিগুড়ির মানু মাসি মাঝে মাঝে ঘুগনি করতো। মাংসের। গামা গাছের ছায়ায় বাতাস উঠলে সে ঘুগনির গন্ধ চারদিক চারিয়ে যেত।

পয়সা দিতে গেলে দোকানী হেসে বলল, লাগবে না বাবু।

কেন?

ওরা দিয়ে দিলেন—

ততক্ষণে মেয়ে দুটি ভিড়ের ভেতর মিশে গেছে। অন্ধকারে ওদের সঙ্গেই পাশাপাশি সিট। ইণ্টারভ্যালে মরা আলোয় মেয়ে দুটির মুখ ভাল করে দেখা হল না। নেশার ঝোঁকে হাফ বন্ধু মতো দুটি মেয়ে পাশে বসে—এটাই কম ভাল লাগছিল না। কখন যে সিনেমা শেষ হয়ে গেল তা বোঝা গেল না।

বাইরে বেরিয়ে মাথায় হাত নিখিলের। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বাস ট্রাম কিচ্ছু নেই। যে রিক্সাই ধরতে যায়—হাতছাড়া হয়ে যায়।

মেয়ে দুটি কিন্তু অবলীলায় দুটি রিক্সা পেয়ে গেল। রিক্সায় উঠতে উঠতে ওদের ডেকে বলল, কোনদিকে যাবেন? নীড় শাড়ি পরা মেয়েটিই বলল।

নিখিল দেখল, এত রাতে বড় জামাইবাবু ছাড়া গতি নেই। সে বলতে চাইল—কোনদিকে?

আমরা কালীঘাট—

বিমল যাবি?

বিমল বলল, এত রাতে নর্থের বাসও তো দেখছি না। কেন যে সিনেমা দেখতে ঢুকলি! এখন?

মেয়েটি বলল, চলে আসুন—

বিমল বলল, সদানন্দ রোডে এক মাসীবাড়ি আছে অবশ্য—

মেয়েটি আবার বলল, ভিজে যাচ্ছি। আসুন—

ওরা দুজন ছুটতে ছুটতে দুই রিক্সায় গিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা আটকানোর ভিজে কাপড়টা ওদের পৃথিবী থেকে আলাদা করে ঢেকে দিল। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে—কোথাও যাওয়ার জন্যে রিক্সার দরকার ছিল ঠিকই। আবার এত রাতে দুজন অজানা মেয়ে রিক্সায় উঠতে ডাকছে—তার মধ্যে কেমন কেমন একটা ভয়, রোমাঞ্চ, রহস্যও ছিল। ব্যাপারটা অদ্ভুতও বটে। আবার সিনেমা হলের ভিড়ে কতক্ষণ দাঁড়াবে বৃষ্টি ধরে আসার জন্যে? রাত তো থেমে নেই।

নিখিলের পাশের মেয়েটি বলল, আপনারা কেউ—কেউ ভি ওখানে রিক্সা পেতো না।

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। হিন্দুস্থানী নাকি মেয়েটি। ঘেরা রিক্সার ভেতর ঘুগনির সঙ্গে মদের গন্ধ। একেবারে ঝাঁঝালো কাঁচা বাংলার গন্ধ। তাহলে ওরাও খেয়েছে। এ কেমন মেয়েরে বাবা!

রিক্সাওয়ালা তখন ছপ ছপ করে জল ভাঙছে।

নিখিল বলল, কেউ রিক্সা পাবে না কেন?

আমাদের বাঁধা রিক্সা। বলা ছিল।

স্কুলের মেয়ে নয় যে রিক্সা মাসকারবারী বাঁধা থাকবে। এরা তবে কারা? নিখিলের নেশা খুলে যাওয়ার দশা।

রিক্সা এসে থামলো কালীঘাট রোডে। বাজারের পাশে।

নেমেই মেয়েটি বলল, কোথায় যাবেন?

চেতলা—

এই ঝণ্টু। দিয়ে আয়।

হামি যাবে না।

বেশি পয়সা পাবি।

হামি আর যাবে না। সারাদিন খেটেছি।

সারাটা পাড়া অন্ধকার। শুধু স্ট্রীট লাইট। তাও অঝোর বৃষ্টিতে ঝাপসা। একটা ভিজে কুকুরও নেই। গলির ভেতর ফট করে একটা আলো জ্বলে উঠল।

কে রে রাজিয়া ?

কোই নেহি। দো মেহমান।

বিমল চাকলাদার রিক্সা থেকে নেমে ঘাবড়ে গেছে। নেশা কখন ছুটে গেছে। সে বলল, চল হেঁটে মেরে দেব।

রাজিয়ার পাশের মেয়েটি বলল, এত রাতে ভিজে ভিজে কোথায় যাবেন ? বসবেন আসুন।

বিমল বলল, নাঃ ! দিব্যি চলে যাবো।

তা হয় নাকি ? আমাদের টিকিট জোগাড় করে দিলেন। খাননি তো কিছু। সেই ঘুগনি। ব্যাস !—বলে হি হি করে হেসে উঠেই রাজিয়াকে পাশ কাটিয়ে মেয়েটি গলিতে ছুটলো। যেতে যেতে বলল, ভিজে কাপড় তো ছাড় আগে—

—সিমেণ্ট মেঝে। চ্যাটাইয়ের দেওয়াল। ওপরে টালি কি টিন এই ঝাপসা আলোয় বোঝার উপায় নেই। বৃষ্টিতে চড়বড় শব্দ হয়েই চলেছে। আরও দু একটি মেয়ের মুখ। এক ভেজানো দরজা ফটাস করে খুলে শুধু আণ্ডারঅয়ার পরা এক পালোয়ান দুম দুম করে বেরিয়ে গেল। ওরই ভেতর কার খুন্তি নেড়ে রাঁধাবাড়ার শব্দ।

নিখিল জানতে চাইলো, কত করে ?

রাজিয়া এবার আলোর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, বসবেন ? তা পঁচিশ টাকা নিয়ে থাকি। আপনারা কুড়ি করে দেবেন।

বিমল তখনো ডিসাইড করতে পারে নি। তাকে দেখে রাজিয়া বলল, কোথায় যাবেন এ বৃষ্টিতে ? কেউ দরজা খুলবে না আমরা ছাড়া। ভেতরে আসুন।—বলতে বলতে রাজিয়া বাঁয়ে ঢুকে প্রথম ঘরের দবজায় টোকা দিল, বেলি ?

ভেজানো দরজার ওপার থেকে চাপা শব্দ এল, লোক রয়েছে। একটু বাদে যাচ্ছি। যা তুই—

পরের ঘরে গিয়ে কোমর থেকে চাবি বের করে ফটাস করে দরজা খুললো রাজিয়া। খুট করে আলো জ্বালালো। বসুন। আসছি

—বলে যাবার সময় বিমলের দিকে তাকালো, একজনকে তো বাইরে একটু দাঁড়াতেই হবে।

নিখিল বলে উঠলো, না না। আমরা এমনি বসবো। গল্প-গুজব কথাবার্তা বলবো শুধু।

ঝনাৎ করে চাবির গোছা বিছানায় ফেলে রাজিয়া বলল, আমি এমনি বসাই না। তেমন ঘর এখানে অনেক পাবেন। যান—আসুন এখন—

কি হল? রাগ করছো কেন?

—খদ্দের ঠকিয়ে পয়সা নিতে পারবো না।

বেশ তো। আমাদের ভেতর না হয় রাজিয়া—

আমার নাম রাজিয়া সুলতানা। কি বলছিলেন?

নিখিল বললো, বিমল না হয় ও ঘরে—যার সঙ্গে এল এক রিক্সায়—

বিমল লজ্জার মাথা খেয়ে এই প্রথম ভাল করে মুখ খুলল। বলল, আমি? আমি থাকলে এ ঘরেই থাকবো।

রাজিয়া একটা গুপ্ত সুখ বা গর্বে মুখের আনন্দ ঢাকতে পারল না। আনন্দটুকু ঢাকার চেষ্টাও না করে রাজিয়া সুলতানা বলল, কী হবে আর চা করে এখন? কিছু খাবেন আপনারা? রোটি তড়কা আনাতে পারি।

নিখিল আর বিমল একই সঙ্গে বলল, না। দরকার নেই কোন।

আমি কিছু খাবো না এখোন। আলো নেভাই?

দাও।

এক ঝটকায় অন্ধকার ঢুকলো ঘরে। জোড়া খাটে শোয়া ওদের দু'জনের কানে বাইরের বৃষ্টির টানা দাপাদাপি ধরা পড়লে।

রাজিয়ার মনেই থাকলো না-সে একটু আগেই বলেছে—একজনকে তো বাইরে একটু দাঁড়াতেই হবে। ঘরে একজন থাকলে আরেকজনের বাইরে যাওয়াই রাজিয়াদের লাইনে দস্তুর। নেহাৎ

যদি বড় করে মাইফেল থাকে তো সে আলাদা কথা। এসব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে রাজিয়া সুলতানা ওদের দুজনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এটাও একটা আহ্লাদের ঝাঁপ। সারাটা সিনেমায় হিরোইন মেয়েটা সারাক্ষণ হেলেদুলে শুধুই আহ্লাদ করেছে—আহ্লাদ খেয়েছে। আহ্লাদ জিনিসটা আল্লার দান।

॥ পাঁচ ॥

বেলা ন'টা নাগাদ ঘুম ভাঙলো নিখিলের। বৃষ্টি ধোয়া পরিষ্কার রোদ্দুর বারান্দায়। মাথাটা টিপ টিপ করছে। বাতাসে ভিজে গোবরের গন্ধ। তড়াস করে উঠে বসেই দেখলো রাজিয়া বড় মগ থেকে কাচের গ্লাসে চা ঢালছে।

বিমল কোথায়?

পঙ্খী উড়ে গেছে। নাও চা খাও মাইরি—

বিচ্ছিরি লাগলো মেয়েটিকে। গালে একটা শ্বেতীর দাগ। কালো চুল টেনে বাঁধা।

নিখিল বলল, কখন গেল?

ভোর ভোর। তোমায় কত ডাকলো। তুমি উঠলে না। চা খাও;

না মাথা ধরেছে। বড়ি টড়ি আছে?

যে বড়ি আছে এখানে তা আমরা খাই। চা খাও। সেরে যাবে। কড়া লিকারের চা তো। খেয়ে দ্যাখো।

চা খেয়ে মাথাটা একটু ছাড়তে একটা সিগারেট ধরালো নিখিল। খাটে বসে বাড়ির উঠোন দেখা যায়। উঠোনের ভাঙা চাতাল গিয়ে আদিগঙ্গার নাবিতে নেমেছে। জল দেখা যায় না এখান থেকে। নৌকোও দেখা যায় না। কিন্তু বোঝাই দেওয়া হাঁড়ি কসলী-খাটানো পাল খাটে বসেই দেখতে পেল নিখিল।

একটা বিড়ি হবে? আমার ফুরিয়ে গেছে।

উহ্। সিগারেট আছে। খেতে পারো।

না! বিড়ি না টানলে পাইখানাই হয় না।

সকালটাই মাটি হয়ে গেল নিখিলের। সে কোন মুসলমান কিংবা হিন্দু মেয়ের সঙ্গে এর আগে রাত কাটায় নি। অবিশ্যি কাটানো মানে খানিক ঢলাঢলি—তারপর বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়া। রোদ বাড়তে পৃথিবী শুকোতে লাগল। সামনের রাস্তায় বাজার বসে গেল দেখতে দেখতে। রাজিয়া এক সময় উঠে গেল। চান করে মাথা আঁচড়ে ফিরে এল। এসে বলল, টাকা দাও। খাবার আনতে হবে না।

ও টাকা দিয়ে গেছে?

পাঁচ টাকা বেশিই দিয়ে গেছে। মাসীকে দিলাম যে।

নিখিলও পাঁচ টাকা বেশি দিল। দিয়ে বলল, রান্না করে খেলে পার।

কে করবে? মদ্দাদের সামলে সারাদিন-তারপর আর খোশ থাকে না শরীরে। তখন ঠারারা গিলে পড়ে থাকি।

বাসন কোশনও তো নেই বিশেষ—

করা হয় নি। হবে কি করে? এ ঘর তো ব্যবসা ফুরোলেই ছেড়ে দিতে হবে।

ব্যবসা থাকতে থাকতে একটা ভাল ঘর দ্যাখো রাজিয়া।

কেন? তুমি এসে থাকবে?

না। তোমাব থাকার জন্যেই।

বেলা এগারোটা দশের মেচেদা লোকাল ধরে নিখিল সেদিন কলকাতার মায়া ত্যাগ করলো। তমলুকে ফিরে আবার সে তাসের আড্ডায় জমে গেল। অফিস। অফিসের পর তাস। সে যে ভাসামানিক। যখন যে জলে ভাসা তখন সে সেখানকার মানিক।

পারিজাত ছেত্রীর সঙ্গে সে কখনো সিনেমা দেখে নি। শোয়নি। এক রিক্সায় জল ছপ ছপ করে ঘরে এসে ওঠেও নি।

সোমবার রাজিয়া সুলতানা তার মনে এল না। মঙ্গলবার এল না। কিন্তু বুধবার অফিসে কাজে বসেই রাজিয়ার শ্বেতী দাগানো মুখখানা তার মনের ভেতর কুঁদে ফুঠে উঠলো। হপ্তাবাবুর মত সে রাজিয়ার জন্যে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার গোপনে টুকটাক কেনাকাটা করলো।

শনিবার সকাল সকাল অফিস কেটে ট্রেন ধরলো। তারপর সন্ধেবেলা কালীঘাটে গিয়ে হাজির। আজ কোন বৃষ্টি নেই।

করপোরেশানের একটা বড় আলোর নিচে রাজিয়া সুলতানা পাউডার আলতা মেখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে খদ্দের ধরতে দাঁড়িয়েছিল। একটি মেয়ে রাজিয়াকে চিমটি কাটলো। এই! দ্যাখগে তোর সেই ও এসেছে—

গোড়ায় রাজিয়া বুঝতেই পারে নি। তারপব নিখিলের মুখখানা দেখে ভারি আনন্দ হল তার। এগিয়ে এসে হাত ধরলো। এই যে বলে গেলে আর আসবে না—

ও একটা কথার কথা। এই আলোটা রাখো। লোড শেডিং হলে জ্বালতে পারবে। ব্যাটারি পরানো আছে—

ওমা! আমার জন্যে এনেচো?

তবে কার জন্যে আবার! এখানে আর কেউ রাজিয়া আছে?

ঘরে এসে নিখিলকে বসালো রাজিয়া। কি খাবে? দিশী আনাই।

একটা ছোট পাইট এনেছি।

দেখি। ওমা এযে বিলিতি। অনেক পয়সা তোমার? বল না? পুলিশে কাজ কর?

তাই মনে হয় দেখে?

ওমা! তাই বলেছি নাকি? এখানে তো অনেক রকম লোক আসে।

পুলিশ আসে ?

আসে না আবার। ফি হপ্তায় দোবার আসা চাই। থানার তোলা দিতে হয় যে। বড়বাবু আমার দেখভাল করেন। বড় ভাল লোক। হপ্তায় হপ্তায় টাকা চলে গেলে কোন হুজ্জোতি আর হয় না। বড়বাবুই আমাদের রক্ষা করেন।

অ। তা চল। বাজারে যাই—

কেন ?

তোমার হাঁড়িকুড়ি নেই। চুলো নেই। এসব কিনে দেব।

আমার ঘরের জিনিস তুমি কেন শুধু শুধু কিনবে ?

কিনে দিয়ে যাই। দিলে তোমার রান্না করে খাওয়ার ইচ্ছে হবে। তাহলে বাজার হাট করবে। বাজার হাট করলে নেশা ভাঙ করার সময় পাবে না—

তার মানে আখেরে আমার ভাল হবে! এই তো ? তা এখন কেটে পড়। এখন সন্ধ্যেবেলা আমাদের ব্যবসার সময়। গল্প করার টাইম থাকে নাকি এখন ?

ধরো আমিই খদ্দের।

বেশ তো। কিন্তু খদ্দেরের মত চালচলন কোথায় ? আসবে বসবে যাবে। অত কথা কিসের ?

চল না রাজিয়া—তোমার ঘর সংসারের জিনিস কিনে আনি।

অনেক সোমসার করেছো মনে হয়। মেলা বকিও না। খদ্দের খসে যাচ্ছে।

সারা সন্ধ্যায় ক'জন খদ্দের তোমার ?

এত খোঁজে কি দরকার ? বাজার ভাল হলে এক সন্ধ্যেয় তা ছ'জন তো হয়েই থাকে—

সবাই সময় মত ওঠে ?

দু' একটা এঁটুলি যে থাকে না তা নয়। তখন বিষ্টুকে ডাকি।

বিষ্টু কে গো ?

সব একদিনে জানবে! আমার তো আরও খদ্দের আসবে। করাত কলের বড় মিস্ত্রি না ফিরে যায়—

গেলে তো লোকসান হবে?

তা হবে। এইটেই আমাদের ব্যবসার সময়—। এসেছো। বোসো। খাও। চলে যাও। লোক লাইন দিয়ে আছে যে—

নিখিল পকেট থেকে দু'খানা একশ টাকার নোট বার করে রাজিয়ার চোখের সামনে তুলে ধরলো। এটা রাখো। আর দুটো গ্লাস আনো। বাইরে বলে দাও আজ আর কাউকে তুমি ঘরে বসাবে না।

দু-উ শো-ও।

হ্যাঁ। দুশো। এই পাইটটা শেষ হলে আমি আর তুমি একটু বেরোবো। দু'একটা জিনিস কিনে আমরা আজ বাইরে খাবো।

তাহলে চল একটা ছবিও দেখি। রূপালিতে –

যদি তোমার করাত কলের বড় মিস্ত্রি ফিরে যায়?

যায় যাবে।—বলে রাজিয়া দু-হাতে নিখিলের গলা জড়িয়ে সামান্য ঝুলে পড়ল।

আর আমার লোকসান কোথায়! সবটাই তো নাফা দেখছি আজ।

সন্ধ্যের মুখে দোর ভেজানো ঘরের ভেতর নিখিলের সোহাগ আর হুইস্কি খেয়ে রাজিয়া সুলতানা কিছু বিজয়িনী হয়ে পড়ল। আসলে একই খদ্দের ফিরে ফিরে এলে লাইনে কার না আল্হাদ হয়? তারপর সে যদি স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের মত একাই সারাটা সন্ধ্যে নগদে কিনে নিয়ে একটা বিলিতির পাইট খুলে দেয়— তাহলে? কার জীবন? ক'জনের জীবনে এ লাইনে এমনটি ঘটে? সে দাঁড়ানো অবস্থায় ঘোমটা দিয়ে নিখিলের গালে ক'টি চুমু খেল।

আর নিখিল ! সে এসেছে শনিবারের গেরস্থর মত—যেমন আর কি তার অফিসের কলকাতার গেরস্থরা শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে কলকাতায়। খামে পাওয়া ঠিকাদারদের নমস্কারীকে নিখিলের টাকা বলেই মনে হয় না। সে রাজিয়ার ভিজে ঠোঁটে আঙুল ঘষে সে টিপ সিঁদুর করে পরিয়ে দিল ভ্রূ মধ্যে। অল্প আলোয় খানিকক্ষণের জন্যে লাইনের রাজিয়া সুলতানা নিখিলের কেনা সন্ধ্যায় দিব্যি বউ হয়ে উঠল। সেই ভঙ্গীতে খাবার জল দিল। রাস্তায় বেরোবার জন্যে নিজেকে সেই ভাবে গোছালো। মায় আঁচলের গুছিতে চাবি বাঁধলো ঘরে দোর দিয়ে। যেন খানিকক্ষণের জন্য দুজনের ওপর দম্পতি নামে একটা জ্বর ভর করলো। অন্য কিছু ঘর ততক্ষণে বন্ধ হয়েছে —খুলেছে—আবার বন্ধ হয়েছে। কেউ কেউ গাহেকের হাত ধরে করপোরেশনের বিজলি বাতির নিচে দাঁড়িয়ে। পাকা কথা বাকি।

কালীঘাট জায়গাটাই বিচিত্র। একেবারে গোলকধাম খেলার কোট। এখানে সাক্ষাৎ কালী আছেন। আছেন গঙ্গা। পাণ্ডা। ধর্মের ষাঁড়; পুলিশের থানা। মাগীবাড়ি। মাগীর দালাল। শ্রাদ্ধ পৈতে বিয়ের সোনা কার্তিকের ঘাট। হাতুড়ে ডাক্তার। গণৎকার। বইওলা। সব। কী নেই। চালে কাঠ হল তো অনন্ত স্বর্গ। নয়তো রসাতল। কিংবা শৌণ্ডিকালয়। আগে চার পয়সার একখানা কাগজে একশো ঘরের ছাপা খেলার কোট নিখিল দেখেছে। এই কালীঘাটে সেই একশো ঘরের সব ঘরই আছে। এমন কি টিনের ফ্রেমে বাঁধানো শনি স্থান রাস্তার পাশেই। যার ইচ্ছে ভক্তি বা ভয়ে পয়সা দাও। আবার ঘর গেরস্থালীর বাসনপত্রও রয়েছে। রয়েছে পুজো আচ্চার চন্দনকাঠ পঞ্চপ্রদীপ। এমন কি বালিকা বয়সের খেলনা বাসনপাতিও সাজিয়ে বসে আছে দোকানী। এত বড় গোলকধাম আর কোথায় ! একই পুরোহিত বিয়ে দিচ্ছে—আবার শ্রাদ্ধের পর ঘাটকামানোর সকালে আদি গঙ্গার পাঁক মাটিতে বৃষকাঠও সেঁধিয়ে দিচ্ছে।

রাজিয়া সুলতানাকে নিয়ে নিখিল থানার উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে একটি তোলা উনুন আর দু'খানা থালা, দুটো গ্লাস একটা হাঁড়ি কিনল। সেগুলো দোকানীর কাছে জিম্মা করে দু'জনে মিলে খেতে বসার একটা রেস্তোরাঁ খুঁজতে লাগল।

যে দোকানই খুঁজে পায় নিখিল-রাজিয়া বলে—ওরা আমায় চেনে এখানে বসতে পারবো না।

শেষে বিজলি আর পূর্ণ সিনেমার মাঝামাঝি একদম গেরস্থ পাড়ার এক রেস্তোরাঁয় ওরা বসলো। পর্দা ফেলে। কেবিনে।

উনুন, বাসন তো কেনা হল। এবার তুমি বাজার যাওয়া অভ্যেস কর রাজিয়া।

বলছো?

হুঁ। তাহলে খরচা অর্ধেক হয়ে যাবে। যে সময়টা পাবে সেটা এটা ওটা রেঁধে কাটাবে। মদ গাঁজা কমবে। পয়সা জমবে। গায়ে গন্ধি লাগবে।

পর্দা তুলে দিলে! আর কিছু করলে না?

আর কি করবো? এখুনি খাবার দেবে তো।

আমার গায়ে হাত দিলে না।

তুমি খুব ছেলেমানুষ রাজিয়া। বলে আস্তে হাতে একটা চুমু খেল নিখিল। খেয়ে বলল, আজ থেকে তুমি আমার নিমফুল।

সে তো খুব তেতো হয়।

না। নিমের মধু সবচে সেরা মধু রাজিরা। তোমরা বাঙালী না?

হ্যাঁ। আগে বাঙালী ছিলাম আমরা। এখন আর নেই—

সে কিরকম?

আমাদের বাড়ি হাওড়ায় ছিল। বাবা পুলিশে দারোগা ছিল। তোমার চেয়েও বেশি কামাতো। আমি বড় মেয়ে তো—খুব আদর করতো আব্বাজান। কিন্তু আমার ছোটবেলায় রায়ট হল

কলকাতায়—সিক্সটি ফোরে—বাবা দাঙ্গা থামাতে গিয়ে ডিউটিতে খুন হল।

তাহলে তো তোমার মা পেনশন পায়।

পেত। বিশ পঁচিশ টাকা। আমরা চার বোন। চলবে কি করে। মা ফের শাদি করল। আমার এই বাবা ইলাহাবাদের প্রতাপগড়ের মানুষ। এফ সি আই গো-ডাউনে নাইটগার্ড।

খাবার এসে গেল। চিকেন দো পেয়াজা। শশা, গরম পাঁপড়' টমেটোর সস। আদর করেই খাচ্ছিল রাজিয়া। খেতে খেতে বলল, আমার আয়ে দুটো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটোটার বাকি। দুশরি শাদিতে মায়ের একটা লড়কা হয়েছে। আমাদের সে ভাই দার্জির কাজ শিখছে।

এক সন্ধ্যের পক্ষে অনেকখানি।

ফেরার পথে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের উল্টোদিকে পাঁঠা বিক্রি আর শাঁখা পরানোর জায়গার মাঝামাঝি মহা গণ্ডগোল লেগে গেল। মাঝ সন্ধ্যায় কালীঘাট। ভিড়। তার ভেতর নিখিলের প্রায় পায়ের কাছে কে এক কৌটো বোমা ফাটালো ভীষণ শব্দ করে।

নিখিলের চেয়ে বেশি ভয় রাজিয়ার। এই অল্পক্ষণের মেশামিশিতে নিখিল লক্ষ্য করেছে—সিনেমা হলের ভেতরকার রেস্তোরাঁর লাগোয়া লিফ্‌ট—পাতাল রেল, যে কোন গণ্ডগোল আর পুলিশকে রাজিয়া ভীষণ ভয় পায়।

বোমাটা ফাটতেই নিখিলের দু'হাত ধরে রাজিয়া বলল, তুমি চলে যাও। ভালোয় ভালোয় চলে যাও। এ নিশ্চয় বিষ্টু।

পাগল হয়েছো নাকি? পেছনে রিকশোয় উনুন—হাঁড়িকুড়ি—এগুলো আগে গুছিয়ে দিই তোমায়—

ও আমি গুছিয়ে নেব'খন। তুমি চলে যাও। বিষ্টু নিশ্চয় একটা হুজ্জোতি বাঁধাবে—

বিষ্টু কে?

ও ছাড়া এ রাস্তায় কেউ বম্ব চার্জ করবে না। ওই যে তোমার সঙ্গে আমায় দেখেছে।

কখন ?

আমরা বেরোবার সময়—

তাতে কি হল ?

বা। পুরুষ মানুষের হিংসের খবর তো রাখো না। আমার কপাল যে ফিরুক তা বিষ্টু কিছুতেই চায় না।

কেন ?

গোড়ায় ভাই পাতিয়ে কাছে এসেছিল। ছুরি মারার ভয় দেখাতো কথায় কথায়। সেই ভয়ে দিন কয়েক ওর বউয়ের মত হয়ে ছিলাম। শেষে দেখি একটা বউ আছে। বাচ্চা ভি আছে। চোলাই বেওসা করে। তখুন কাটান দিলাম। সেই তো রাগ। আমায় ভাড়া খাটাবে—নিজে ভি ফুর্তি লুটবে চোলাই বেচবে—এই তো মোতলোব শালার। তারপর তোমায় দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে। বোম ফাটালো। এবার চাক্কু চালাবে—

এই ব্যাপার। তা আসুক। আমিও চালাবো।

তুমি কি চালাবে ?

ঘুষি চালাবো।

ভদ্দলোক আছো। পারবে না। তুমি এইবার চলে যাও।

পাগল হয়েছো !

॥ ছয় ॥

নিখিলের নিজের জীবনটা শ্যাওলা পড়া লাগে। উকো দিয়ে নানান জায়গায় ঘষা দরকার। পড়াশুনো করা হয় নি। বইপত্তর বলতে কিছু পত্র-পত্রিকা ছাড়া কিছুই পড়া হয় নি। মা নেই। বাবা নেই। দিদি-দাদা থেকেও নেই। বাড়ি নেই। কোন বন্ধন

নেই। কোন দায় নেই। এক একটু চিনচিন করে বুকের ভেতরটা-বড় জামাইবাবুর জন্যে। সন্দেহ হয় তিনি বোধহয় এর ভেতর মারা গেছেন।

সুখস্মৃতি বলতে রায়পুরে ভানুর সঙ্গে খেলা। মায়ের কোলে বসে ভরত মিলাপ আর রামরাজ্য দেখা। বড়দি বেঁচে থাকতে ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ঢেউয়ের গা ধরে ঘোড়ার গাড়ি করে জামাই-বাবুর অফিসে যাওয়া। আড় বাঁশীতে জামাইবাবুর বাজানো মালকোষ শোনা। আর বাকি সব? সবই দুঃস্বপ্ন।

একদম ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আগে ভানুর ঠোঁট একটু নড়ে ওঠা—দুঃস্বপ্ন।

দাদুর কচুড়ি খেতে চাওয়া-দুঃস্বপ্ন।

ছোড়দির দশ হাজার টাকা ধার চাওয়া-দুঃস্বপ্ন।

গুরু ভাইদের নিয়ে বড়দার নামগান—দুঃস্বপ্ন।

তাহলে জীবনের বাকি থাকে কি? মানু মাসির শিলিগুড়ির, গামা গাছতলার মেসো—কাঠের বেঞ্চে পারিজাত ছেত্রীর হাত থেকে ধোঁয়া ওড়ানো ঘুগনির প্লেট নেওয়া, বর্গভীমার মন্দির চাতালে বলির রক্তে ভিজে হাঁড়িকাঠ ভোর ভোর রোদে জেগে উঠছে। লাগোয়া নদীর বুকে বহু নিচে সামান্য জলে গাঁথা মালা অবহেলায় ভেসে যায়।

আর বাকি থাকে কি? আর থাকে গড়িয়ে গড়িয়ে অফিস করে এক তারিখে পেঁছিলে মাস মাইনের প্যাকেটেও পেঁছে যাওয়া যায় আপনা আপনি। আর একদম বিনা চেষ্টায় ঠিকাদারদের ভক্তি সহকারে দেওয়া নানা সাইজের খাম।

কাল রাজিয়ার চিঠি এসেছে। রাজিয়া লিখতে পারে না। পাশের ঘরের বেলি ক্লাশ সিক্স অবদি বাংলা স্কুলে পড়া হালিশহরেব মেয়ে। সেই লিখে দিয়েছে। বলেছে রাজিয়া।

চিঠির শেষে সই-বাংলায়-অনেক কষ্টে নিখিলের শেখানো। ইতি

তোমারই-কেয়া। নিখিল ইদানীং কেয়া বলেই ডাকে রাজিয়াকে। রাজিয়া কালীঘাটে রাজিয়াই আছে। নিজের বাপের বাড়িতেও সে এখনো রাজিয়া সুলতান।

মাঝে একদিন নিখিল যখন রাজিয়ার ঘরে—ঠিক তখনই পুলিশ রেইড্ হল। ভ্যানে পুলিশ তাকেও তুললো। একজন কানা এ এস আইয়ের আওয়ায় ছ'জন পুলিশ মিলে কালীঘাট, কে পি রায় লেন, বনমালী নস্কর লেন, লখার মাঠ হানা দিয়ে চোর, পকেটমার, নিখিল, কাকুলি, দালাল, বেশ্যা বোঝাই দিয়ে ভ্যান নিয়ে যখন থানায় পৌঁছালো—তখন রাত দশটা।

এ এস আই গোড়াতেই বলল, আপনাকে লকআপে দিচ্ছি না। কেসও লিখছি না। কিছু খরচা করে বাড়ি চলে যান। আপনাদের মত ভদ্দরলোক এসব জায়গায় আসেন কেন?

আমরা শীগগির বিয়ে করবো।

যখন করবেন তখন দেখা যাবে। আর মেয়ে নেই দেশে! মা বাবা আছে?

না।

একশোটা টাকা রাখুন।

সঙ্গে নেই স্যার।

এমন সময় পাগলিনীপারা রাজিয়ার থানায় প্রবেশ। এসেই এ এস আইয়ের টেবিলে একটা বাংলা মদের বোতল রাখলো। মদের বদলে ভেতরেভালদোকানেরচা। কুর্ণিশ করেবলল, বিষ্টুটা লাগানি ভাঙানি করেছে সাহেব। জানি। চা টা খান। এই ভদ্দর ঘরের বাবুটারে ছেড়ে দিন। বলে গিট দেওয়া একটা রুমাল রাখলো টেবিলে।

রুমালটা তুলে এ এস আই প্যান্টের পকেটে ভরলো। তারপর চোখের ইসারায় নিখিলকে ছেড়ে দিতে বলল। আর আসবেন না এদিকে। এলে আমাদের বলে আসবেন কিন্তু। কালীঘাট জায়গা ভাল না—

বাইরে বেরিয়ে এসে নিখিল জানতে চাইল, কত দিলে ?

যা ছিল।

কত ছিল ?

তুমি যা দিয়েছিলে। আমি তো তোমার টাকা গুনতি করি না।

দু'জনে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে অনেকদিন পরে আবার বসুশ্রীর সামনে এসে দাঁড়াল। সেখান থেকে এগিয়ে ওরা যতীন দাস পার্কে গিয়ে বসলো। রাজিয়ার মুখখানা আগের চেয়ে অনেক মোলায়েম লাগে নিখিলের।

রাজিয়া বলল, তুমি আমায় একবার কেয়া বলে ডাকো।

কেন ?

ওই নাম অনেক ভাল শোনায়।

তা ডাকছি। কিন্তু দেড়শো টাকার সবটাই থানাই দিয়ে এলে !

না হলে ওরা তোমায় ছাড়তো ? এসব বিষ্টুর কলকাঠি। নয়তো থানার হপ্তা তোলা তো কবে কিলিয়াব করে দিয়েছি।

না হয় ছাড়াত না আমাকে।

কি বলছো বাবু।

ওই নামে ডাকবে না তো কেয়া।

বেশ বাবা বেশ। থানায় টাকা না দিলে তোমায় ছাড়তো না। না ছাড়লে খবর হয়ে যেত। অফিসে চাকরিটা গুণহাগার দিতে হত। তখন ?

চাকরি যেতো তো যেতো। তুমি আমায় বসিয়ে খাওয়াতে কেয়া।

মুখে রুচতো ? গুসসা হতো খালি। গেলাবার জন্যে আমাকে আরও গাহেক নিতে হত ঘরে। তোমার রাগ বাড়তো। খিটখিট করতে।

তা সত্যি। কবে যে খদ্দের নেওয়া বন্ধ হবে কেয়া।

আমিও কি ভাবি না। ভাবি বাবু—আমিও ভাবি। ভেবে ভেবে পথ পাই না। ঘর ভাড়া, পুলিশ, মুদীখানা, ডাগদর, মামী—তারপর কিস্তিওয়ালার আগের ধার। যখন আর কুলকিনারা পাই না তখন কাঁচা চোলাই গিলে বেহোঁশ হয়ে পড়ে থাকি। তুমি না থাকলে এক একদিন বাংলা গিলে রেসের মাঠে যাই। যদি কপাল ফেরে—

ফেরে?

ইস! পোড়া কপাল। ভিখিরি হয়ে ফিরে আসি। আবাব খদ্দের টানি। আগে জুয়া খেলতাম। এখন আর খেলি না। বড় ভয় হয়—আবার যদি ভেসে যাই।

করাত কলের সেই বড় মিস্ত্রী আসে?

লোকটা আমার পোষা এখন। ভাল কথা—এবার যা হয় একটা কিছু কর। আর পারা যায় না। বিষ্টু এর ওপর আবার চাকু মারার ভয় দেখাচ্ছে।

ও কিচ্ছু করবে না বিল্লি আছে। বিল্লি।

তবু বাবু, একটা কিছু কর। তাড়াতাড়ি কর। ফের ভেসে যেতে পারি তো।

বিয়ের নোটিশ তো দিলাম। একমাস হোল। রেজিস্ট্রি অফিসে দু'জনে যেদিন যাব—দেখবে কেয়া সবাই তাকিয়ে থাকবে তোমার দিকে—

সেদিন কি কোনদিন আসবে। বিশ্বাস হয় না বাবু।

কেন?

আমার কপালটাই খারাপ। আব্বাজান তো মরে গেল। আমি ছাই কেটে কয়লা তুলি। এক কালকিনের বাড়ি ঝি গিরি করার সময় সে আমায় কুন্সীগঞ্জে চালান করলো। সেখানে দু'বছর থেকে হাওড়ায়। তারপর এই কালীঘাটে। পুরুষমানুষ রাক্ষষ আছে। একবার এক গাঁ থেকে দুই ছোকরা এল। মোটা

টাকায় চুক্তি করে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে নিয়ে গেল। নিয়ে গিয়ে সেখানে ফুর্তির নামে চৌদ্দ পনেরজন মিলে রেপ করলো। আমি বেহোঁশ। সেই অবস্থায় রেড্ রোডে ফেলে রেখে গেল। কোন টাকা পয়সাও দিল না শেষে পুলিশ তুলে হাসপাতালে দেয়। একদিন দেখি সেই ছোকরাদের একজন কালীঘাট মন্দিরে পাঁঠা কিনছে। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে ফেললাম। সব বললাম বড়বাবুকে। ছোকরা চালান হয়ে গেল।

সোনাগাছিতে ছিলাম একদিন। পাগলা হবার দশা। পাইপ বেয়ে নেমে পালিয়ে আসি। ওয়াটগঞ্জ খুব সুন্দর জায়গা। এক বছর ছিলাম। একটা গিরিক জাহাজের লস্কর-ফরসা ছোকরা বিয়ে করতে চেয়েছিল।

রাজিয়ার কালকের চিঠিখানা খুললো নিখিল। বড় বড় হরফে লেখা।

আমাদের বিয়ের আর ক'দিন বাকি? সামনে—বকর ঈদ। মা তোমায় একবার নিয়ে যেতে বলেছে। আজকাল আমার একা একা দারু খেতে ভাল লাগে না। কবে আসবে। কেয়া—

॥ সাত ॥

এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে এলে হেস্টিংসে মেরিন হাউস, দইঘাট, গার্ডেন রিচের ভাঁজ করা পোল পেরিয়ে মসজিদটোলা অবদি সিধে যেতে হবে। তারপর রাজা বাগানে তেমাথায় মোড় থেকে একটুখানি এগোলে রাজিয়াদের বাড়ি। পুলিশ ফাঁড়ি আর বটতলার মাঝের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু তার আগে কালীঘাটে যাওয়া যাক।

নিখিল রাজিয়াদের ঘরের সামনে এসে অবাক। বেলির দরজায়

নতুন মেয়ে দাঁড়িয়ে। রাজিয়ার মুখ গম্ভীর। একটা বছর দুইকেব বাচ্চা মেয়েকে একবার রাজিয়ার ঘরে ছুটে যেতে দেখা যাচ্ছে। আবার সে বেলির ঘরে ফিরে আসছে।

ব্যবসার জন্যে খদ্দের ধরতে গলির মুখে তিন চারটির বেশি মেয়ে দাঁড়ায় নি আজ। অথচ কালীঘাটের সেই বিখ্যাত দ্যাখন ভিড়ের আজও কোনও খামতি নেই।

ডিলাক্স বাসে এলে?

না। মিনিবাসে।

তাহলে টিকিট বাচ্চাটাকে দাও—

বেলির বাচ্চাটা না?

হ্যাঁ।

বেলিকে দেখছিনে। ফুর্তি মারাতে গেছে বাইরে। বাচ্চা গছিয়ে দিয়ে গেছে তোমায়—। ওকি—? বলে ছুটে এগিয়ে গেল নিখিল। অমন কাঁদছো কেন?

বাজিয়া কোন কথা না বলে চ্যাটাই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হু হু করে কাঁদছে। আর কিছু বুঝতে না পেরে বেলির মেয়েটা রাজিয়ার উরু ধরে ডাকছে—মাম্-মা—

কি হল? বলবে তো।

বেলি নেই।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ। কাল সকাল থেকেই পেটে ব্যথা। তারপর সন্ধ্যের দিকে বমিটমি করে মরে গেল। ওর সেই বাবুর দরুন বচ্চোটাকে বাবুকে মা আজই সকালে ফেলে দিয়ে গেছে। কি কবি এখন বলতো?

এখানো এই কালীঘাটে সব সমস্যাই গরম আলু। হাতে রাখা যায় না। এখুনি একটা সমাধান চাই। বেশ্যার জারজ গতকাল মা হারিয়েছে। এখন রাজিয়ার পা ধরে নিজের মাকে খুঁজছে।

কি বলবে নিখিল। কি বলা যায়। রাজিয়ার ঘরখানাই চড়া ভাড়ার ঘর। কলকাতায় নিখিলের কোন থাকবার জায়গা নেই। বসার জায়গা বলতে পাকের বেঞ্চ। নয়তো রেস্তোরাঁর চেয়ার। রাজিয়ার ঘরে বসেও তাকে টাকা গুণে দিতে হয়। নয়তো বেচারা ঘরভাড়া দেবে কোত্থেকে? খাবে কি? আসলে রাজিয়ার সঙ্গে সে যতটাই থাকে ততটাই সে সময় ধরে কিনে নেয়। নয়তো মেয়েটা বিপদে পড়বে। এর ওপর আবার মরা বেলির দু'বছরের ছানা। চমৎকার।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল—খিদিরপুর বাজারের সামনে রাজিয়া সুলতানাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামছে নিখিল। তার কোলে বেলির বাচ্চা। সিমাই, জরি বসানো তাজ, সালোয়ার কামিজ আর পাকা খেজুর কিনে নিখিল বলল, এবার চল। কামিজটা তোমার ছোট বোনের হবে তো—

রাজাবাগানে বাড়ি অবদি ট্যাক্সি যায় না। রুটি গোস্তের দোকান। রাজিয়াকে বাচ্চা সমেত ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে অনেকে হাত নাড়ল। কিন্তু নিখিলের মুখ দেখে কেউ বিশেষ হাত নাড়ল না। খেয়াল হল নিখিলের—সে ধুতি পরে আছে। এখানে আসার কথা খেয়ালই ছিল না।

ছোট্ট পাড়া। এক ইঁটের দেওয়াল। ওপরে টালি। মুর্গি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঁচা ড্রেন। এক সময় খারাপ দেখতে ছিল না—এখন কেমন রঙচটা বাসনের মত রাজিয়ার মাকে দেখেই প্রণাম করতে গেল নিখিল।

মহিলা বাধা দিল। তোমার কথা শুনেছি। তুমি খুব দিলদার।

রাজিয়া খুব খুশি হয়ে খেজুর আর জামাকাপড় তক্তপোষের ওপর রাখল। সেখানে খাটের কিনারে তার ভাই বোন বসে। তাদের পাশে গিয়ে বসলো নিখিল।

রাজিয়ার মা বলল, আমার কামানেওয়ালী বেটি এই সংসার চালু রেখেছে বেটা।

নিখিল বলল, আমি সব জানি। আপনি কিছু ভাববেন না মা—

এমন সময় বাইরে একটা হই চই উঠলো। সংসার চালাতে হিসসিম খেয়ে যাওয়া রাজিয়ার মায়ের চোখ কেঁপে উঠলো। সে বাইরে ছুটে গেল। ক্যা বাত ?—

ছেলেগুলো কি যেন বলল। রাজিয়া সুলতানা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল। কিছু না বুঝে বাচ্চা মেয়েটি একা একা মেঝেতে ঘুরছিল।

রাজিয়ার মা তখন উর্দু আর বাংলা মিশিয়ে চেঁচিয়ে বলছে— রাজিয়াকো তো শাদি কর লিয়া—মুঝে মা কহেলর ডাকা—তুম লোগো কো তরহা সিরিফ গুলছড়ি নেহি উড়ায়া! হিন্দু হো তো ক্যা হুয়া? ইনসান তো হ্যায়—

এ কথায় ভিড়ের গোলমাল যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজিয়ার মা ঘরে ঢুকে চাপা গলায় বলল, আমার মেয়েকে তুমি শীগগির বিয়ে কর। আর দেরি কোরো না।

তাই হবে মা--

নিখিলের এ কথার পরেই রাজিয়ার মা বলল, কুছ বুরা তো নেহি মানিয়েগা? এক বাত্ বল্?

নিখিল তার জানা উর্দু মত বলল, সখসে মাতাজী—

এখানে যখন আসবে—তখন মোড়ের মাথায় ওই হিন্দুর মেঠাই দোকানে বসবে। ওখান থেকেই খবর দেবে। আর রাজিয়াকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। তাহলে আর কোন গোলমাল হবে না বাবা—

তা হবে মা।

রাজাবাগান থেকে ফেরার পথে রাজিয়া বলল, আমার জন্যে তোমার মাথা নিচু হল। মুসলমান পাড়ায় ছেলেগুলো বিয়ে

করার পক্ষে না-লায়েক। আর কেউ যে এগিয়ে এসে আমার ছোট বোনটাকে বিয়ে করবে এমন সাহসও নেই কারও। কিন্তু মুসলমানী আছে ষোল আনা। কোথায় কে হিঁদুর হাত ধরে এল গেল-সেদিকে কড়া নজর আছে।

তোমার বাবার সঙ্গে তো দেখা হল না।

বাবা নাইট ডিউটি দিয়ে এসে দিনের বেলা ফল বেচতে বেরোয়।

বুদ্ধি করে তোমার মা বলে দিল-আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে নইলে ?

আজ আমাদের হয়রানি করতো। আবার কি। কোন কাজ তো নেই ওদের। সব আপনা ইমাম বনে গেছে।

অটো ধরে কে জি ডক অব্দি এসে তবে ভাঁজ করা পুলের মুখে ট্যাকসি পাওয়া গেল। অনেকক্ষণ দু'জনের মুখে কোন কথা নেই। রাজিয়া ভাবছিল ঈদের বাজার করে খরচাও করে গিয়ে মানুষটা মায়ের ওখানে দু দণ্ড স্বস্তি পেল না। হিন্দু হিন্দু করে পাড়ার মস্তানগুলো শোর তুললো। এর চেয়ে দুলাল চাচর মিঠাইয়ের দোকানে ওকে বসিয়ে রেখে যদি নিজের মায়ের কাছে যেতো তাহলে মুখরক্ষা শেষরক্ষা-যা-ই বল হত।

কী বিচিত্র শ্বশুরবাড়ি থেকে সে ফিরছে এখন। বিধবা শাশুড়ি ফের বিয়ে করেছে। নতুন শ্বশুর নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরে ফল বেচতে বেরিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা তাকে হিন্দু বলে বরদাস্ত করতে পারে নি। ছোট শালিটির বিয়ে বাকি। তা নির্ভর করছে রাজিয়া কতটা গাহেক ঘরে তুলতে পারবে-তার ওপর। নিজের মনে মনেই হাসতে গিয়ে নিজেকে বোঝালে নিখিল-তাও তো একটা অদৃশ্য ভালবাসা ওদের এক জায়গায় বেঁধে রেখেছে। তাই না ও ঈদের উপহার নিয়ে যেতে পেরেছে। ওর নিজের বাড়িতে মা বেঁচে থাকতে মা মরে যাওয়ার পর-সেই বাঁধনও তো ছিল না। নইলে সে কেন এত বছর ধরে শুধুই ভেসে বেড়াচ্ছে।

বরং এখন বাচ্চাটা কোলে থাকায় রাজিয়াকে নিয়ে তার এই প্রতিষ্ঠান-যাকে বলা হয় দম্পতি-বেশ বিশ্বাসযোগ্য দেখাচ্ছে কলকাতার রাস্তাঘাটে। শাশুড়ি ঠাকরুণ তো ভাল পরামর্শই দিয়েছে-রাজাবাগানে গেলে সে যেন দুলাল চাচার মিঠাইয়ের দোকানে বসে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না রাজিয়া তার মায়ের কাছ থেকে ফেরে।

এ কি? ট্যাকসি কোন দিকে চলছে?

আমি হাওড়া স্টেশন যেতে বলেছি। আসানসোল যাব। তোমার আর কালীঘাটে ফেরার দরকার নেই। আসানসোলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্টার খালি পড়ে আছে। তোমায় রেখে আমি ফিরে যাবো।

চলবে কি করে?

টাকা পাঠাবো। এখন যাবার সময় দিয়ে যাবো কিছু তোমার হাতে। চলবে না?

তা চলবে। কিন্তু মায়ের হাতে টাকা পাঠাবো কি করে ব্যবসা না চালালে?

সে টাকা আমি পাঠিয়ে দেব কেয়া—

থামো। ট্যাকসি ঘোরাও বলছি। এই ট্যাকসি-কালীঘাট চল।—বলে রাজিয়া নিখিলকে বুঝিয়ে বলতে লাগল। সরকারী নকরির হালৎ সে হামার জানা। তুমি কোত্থেকে এত খরচা একসঙ্গে দেবে? দিতে গেলে ফতুর হয়ে যাবে। আমার আপনা আব্বাজান সরকারী নোকর ছিল। দারোগা ছিল। সে ভি সুবিধা করতে পারতো না। এই বাবাটা তো পারেই না। আর তুমি তো পুলিশ নও। থানা ডিউটি করো না তো তুমি। তুমি হালে পানি পাবে না। যে কোন সবকারী নোকরের চেয়ে তোমার এই রাজিয়া রাড় বেশি কামায়। বুঝেছো? আমি এখন বসে গেলে তুমি হালে পানি পাবে না।

॥ আট ॥

বেবিকে ভাত খাইয়ে—নিজে খেয়ে একটু শুয়েছিল রাজিয়া। এমন সময় খট্ খট্। এখন কে এল রে বাবা?

এই সময় আসে খুব চেনা লোক। নিখিল আসে নি তো? আর এসে থাকতে পারে স্কুল কলেজ পালানো ধাড়ি ছেলে। এরা এসে চুপচাপ বসে থাকে। কথা বলে কম। পারেও না ভাল।

ঘুম চোখে দরজা খুলে বাজিয়া দেখে করাত কলের মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে।

ঘরে ঢুকবে কি না-চোখে অনুমতি চাইল মিস্ত্রি। বড় সড় চেহারা। হাড় হাড়। প্রমাণ সাইজের গোঁফ নাকের নিচে। মাথাটি শাদা কালো।

রাজিয়া মনে মনে কৌটোয় রাখা টাকাগুলো গুণলো। গুণে বুঝলো—আরও দরকার। তাই হ্যাঁ বলার কায়দায় দরজা হাট করে। চৌকিতে এসে বসলো। বেবি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আজকাল ওকেই বেবি মা ডাকে।

অসময়ে এলাম। সারাদিন করাত চলে তো। ফুরসৎ হয় না তো।

বলার কথাটা এই বেলা বলে ফেল। বাচ্চা জেগে গেলে কথা হবে না কিন্তু।

ওঃ। তা বলছিলাম -একখানা ঘর দেখে রেখেছি গোপালনগরে। কল পাইখানা কমন। রান্নার জায়গা আলাদা—লাইন আছে।

ওঃ! এই কথা। আমায় রাখবে ভেবেছো?

তেমন তো সাধ আছে অনেকদিনের।

আমায় রাখতে গেলে খরচ খরচা সব সামলাতে পারবে?

আমার তো বয়স হয়েছে। ওভার টাইমের চারশো টাকার

সবটাই তোমার জন্যে ঢালতে চাই। হপ্তাভর না-ই থাকলে গোপাল-নগরে। সাতদিনে দুটো দিন আমার জন্যে দিতে পারো না?

কে কে আছে তোমার?

কে নেই! বউ। ছেলে মেয়ে। ছেলের বউ। জামাই। সবাই। সবাই আছে। আমার কথাটা একটু ভাবো।

ভেবেছি। মাসে আটদিনে চারশো টাকা। একটা পুরো দিনি আমার কামাই কত জানো?

সে গতর আছে—এখনই তো কামাবে—

পোষালে না। মিস্ত্রি তুমি বরং একজন খোঁড়া খুঁতো কাউকে দ্যাখো। আট দিনির আট দিনই থাকবে পুরো। মউজ মিটিয়ে কাটাবে'খন। চারশো টাকাতেই হয়ে যাবে। নাও—বসবে নাকি?

এলাম যখন বসে যাই। কিন্তু তিনটে টাকা যে কম আছে।

তাতে কি মিস্ত্রি—তুমি হলে গে ঘরের লোক। কখনো কম হবে। কখনো বেশি হবে। দুনিয়ায় তাই তো নিয়ম মিস্ত্রী।

একবার পুজোর আগে বড় মিস্ত্রি তাকে একখানা নাকছাবি দিয়েছিল। তখনো সোনা এমন লাফায় নি।

আড়ে পাশে মিস্ত্রির ধরাধরি, ছোঁয়াছুঁয়ি বেশ সুন্দর। রাজিয়ার বড় পছন্দের। যেমনি করাত কল চালায়। তেমনি রাজিয়াকে ধরে। কখনো আলগোছে। কখনো আবার সাপটে। মাঝে মাঝে তার বোধহয়—মিস্ত্রি তাকে জড়িয়ে ধরে তার শরীরের বোতামগুলো একটা একটা করে টিপছে।

ঘুমন্ত বেবির পাশে বসে বড় মিস্ত্রি এবার হাঁপাতে লাগল। হাজার হোক বয়স যাবে কোথায়। তাগড়া গোঁফ, কেঠো হাত, কাঁচাপাকা চুলে ওভার টাইম খাটা মানুষটা যতই টনকো ভাব করুক আসলে তো পুরনো হয়ে আসা মানুষ।

দেখে রাজিয়ার মায়া হল। ধমসানো সায়া ব্লাউজ ছেড়ে নতুন কাপড় পরলো রাজিয়া। তারপর কাছাকাছি এসে পিঠে হাত রেখে

টের পেল—ঠিক নিখিলের মতই পুরুষালি পিঠ। বলল, ওভার টাইমের পয়সা এভাবে জলে না দিয়ে দুধ খাও। ফল খাও। গিন্নিকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো—

আমরা সবাই ভাল হয়ে গেলে তোমাদের চলবে কিসে!

আমরা? খারাপ আছি। খারাপ থাকবোও। আমাদের পুষতে দুনিয়ায় কখনো খারাপ মানুষের টান পড়বে না।

বড় মিস্ত্রি ওকে একটানে কাছে নিল। নিয়ে বলল, তোমায় মাথায় করে রাখবো। রানী হয়ে থাকবে। এখান থেকে ওঠো।

তোমার টাকা কোথায় বুড়ো!

বুড়ো বললে?

তা নয়তো কি? সারাদিন খাটুনির পর ওই ক'টা টাকা পাবে উপরি খেটে-সে টাকাও আমায় দিয়ে গেলে কি খাবে?

সে আমি বুঝবো। তুমি রাজি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওই গোজামিলে আমি নেই। এই যেমন আসছ-যাবে আসবে-তেমনই ভাল। আলাদা করে আমায় রাখার সখ কেন?

তোমায় নিয়ে আমি তারকেশ্বর যাবো। বেশ বড় একটা কুমড়ো কিনে ফিরবো দু'জনে।

আমার অত সখ নেই। কাছাকাছি গাজিয়ার দরগায় যাওয়া হল না—আর সেই কোন্ তারকেশ্বর!

হবে। হবে রাজি হও। তোমার কোন সখ পড়ে থাকবে না দেখো।

॥ নয় ॥

সলিলদা। আমায় একটা ফ্ল্যাট দিন।

সবে তো জমি নেওয়া হল। সরকার রিজোলিউশন নিয়েছে—কম মাইনের লোকরাও যাতে বাড়ি কিনতে পারে—কিস্তিতে তার

ব্যবস্থা করা হবে। তুমি নিখিল বরং অফিসে এসো। এটি কে?

আমার মেয়ে—

আচ্ছা। বাঃ!

কবে নাগাদ বাড়ি উঠবে। একবার শুরু হলে তো বেশি দেরি হয় না।

তবু?

বছর তিন চার ধর।

নাঃ! তাহলে আমার হল না সলিলদা। তোমাদের এল আই সি-র তো অনেক ফ্ল্যাট থাকে। কম ভাড়ায় শুনেছি। তার একটা।

সে সব ভাই মিনিস্টারের ভাইপো, ভায়রা না হলে হয় না। বাচ্চাটির সব টিকা ফিকা দিয়েছো তো।

সবই দেওয়া।—বলে একটা দুষ্টুমি জাগলো নিখিলের মাথায়। মুখে বলল, এ বাচ্চা আমার দত্তক নেওয়া তা তো জানো।

হুঁ। শুনেছি।

শুনে থাকবে—কোত্থেকে দত্তক নিয়েছি!

তাও শুনেছি।

ওখানে জন্মে তারপর যদি কেউ বেঁচে থাকে—তার কি আর কোন টিকা, পোলিওর ওষুধ, ট্রিপল অ্যান্টিজেন দরকার হয়, সলিলদা?

তা তো ঠিকই বলছো।

এল আই সি-র সলিল দত্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে মনে হল নিখিলের—তাহলে কী কোন রাস্তাই নেই? আমি ট্রেনে তমলুক থেকে ছুটে এসে দেখব রাজিয়ার ঘরে খদ্দের—আর দরজা ভেজানো। খদ্দেরদের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের স্বপ্নটা—মানে সংসার করার ব্যাপারটা মাঝে মধ্যে বলব। তারপর আবার সেই তমলুকে ফিরে যাবো একা একা। জানলার পাশে সিটে বসে। মাঠ দেখতে দেখতে।

এই জন্যে রেজিস্ট্রি বিয়ে করলাম !

দুলালের মিঠাইয়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকে। ওখানেই রাজিয়ার ছোট ভাই এনামেলের থালায় করে চা জলখাবার দিয়ে যায়। আর এগোয় না নিখিল ! পাছে পাড়ার ছেলেরা টিটকিরি দেয়। হুজ্জোৎ বাধায়। তাই।

রেজিস্ট্রি বিয়ের পর রাজিয়াকে নিয়ে এক রবিবার বন্ধুদের চায়ের আড্ডার দোকানে গিয়েছিল নিখিল। সবার সামনে কেয়া বলে পরিচয় করিয়েও দেয়। সবাইকে বলেছিল—সালাম ! নমস্কার !!

বন্ধুরা তো কুঁচেকে গিয়ে একেবারে কেঁচো। পাছে ছোঁয়া লাগে এই ভয়ে—পাছে রাজিয়ার খাওয়া জলের গ্লাসের সঙ্গে মিশে যায় এই আতংকে—ঝটপট উঠেই পড়ল সবাই। সব বোঝে নিখিল। সব বোঝে। তবু চুপ করে থাকে।

বেবি বলল, বাবা মা যাবো।

ঠিক যেন আর পাঁচটি বাচ্চার মতই মায়ের কাছে যেতে চায়। এখন ফিরলে কি রাজিয়াকে ফাঁকা পাওয়া যাবে ? যেই শুনেছে—বাড়ি নিতে হলে আগামের মোটা টাকা লাগবে—অমনি লোক নেওয়া বাড়িয়ে দিয়েছে। যে করেই হোক চার পাঁচ হাজার টাকা রেডি করতে হবে। নিখিল একা পেরে উঠবে কেন ?

আজ কালীঘাটে ফিরে ও বেবিকে রাজিয়ার কাছে যেতে দিল না। সরকারী ছুটির দিন পড়ায় লোক আসার কামাই নেই। বলল—তাতে কয়েক বছরের ভেতরেও বাড়ি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আর ছ'বছর এভাবে তমলুক-কালীঘাট করলে তাদের দু'জনে কিছুই থাকবে না। তখন ঘর বাঁধাও যা-না বাঁধাও তাই।

এখান থেকে এখন রাজিয়াকে টানতে গেলে সবার চোখের কাঁটা হতে হবে। বিষ্টু কিছুদিন চুপচাপ আছে। খাৎ খোৎ খুঁজছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

বাড়িউলি তো পুরনো ভাড়ায় সুদ চড়িয়েই চলেছে। এই করে কি রাজিয়া কোনদিন পরিষ্কার হয়ে বেরোতে পারবে ?

ঠিক এই সময় রাজিয়া দরজা খুলে বেরোলো। কতক্ষণ এসে বসে আছো ? মাসির ঘরে গিয়ে বসনি কেন ?

কথা আছে। শোন।

রাজিয়া এগিয়ে এল।

চল ওই মোড়ের মাথায়—

কোন ছেলেমানুষি করছো না তো ?

দ্যাখোই না কি করি। বলে হাঁটতে হাঁটতে ওরা মন্দিরের সামনে পাঁঠা বিক্রির জায়গাটা পেরিয়ে এল। এসেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে রাজিয়াকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢোকালো নিখিল। এখন কোন কথা বলবে না—

কোথায় যাচ্ছো ? আজ ছুটির দিন। এখন আমার ব্যবসার সময়।

অনেক ব্যবসা হয়েছে। আজ থাক।—বলে ট্যাক্সিওয়ালাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে বলল নিখিল।

কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

সিধে আসানসোল। ওখানে আমাদের পি ডবলু ডি'র অনেক কোয়ার্টার খালি পড়ে আছে।

টাকা পয়সা যে কিছু আনিনি।

তুমি সই করে দিও। আমি ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে যাবো।

সাবির কাছে আশি টাকা পাই।

ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দেব ? কি বলছো ? গতর খাটানো এতগুলো টাকা ?

যায় যাবে ! আমাদের জীবনটাই চলে যেতে বসেছে কেয়া। আর কতদিন আমি ভেজানো দরজার বাইরে বসে থাকবো বলতে পারো ?

আর ক'টা দিন লক্ষ্মীটি। ভাড়া বাড়ির আগাম টাকা রেডি হয়ে এসেছিল।

ও টাকা পরে কাজে লাগবে।

তাহলে তুমি থাকবে তমলুকে—আর আমি মেয়েটাকে নিয়ে আসানসোলে।

আমি বদলি চাইবো। আমার অফিস কলিগরা তোমায় দেখবে।

॥ দশ ॥

সরকারী ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার নিখিলকে শিলিগুড়ি থেকেই চিনতো। চাবি দিয়ে বলল, দুটো বালব্ লাগিয়ে দিচ্ছি। আর দুটো বিছানা দিতে পারি নাইট গার্ডদের—

—তাতেই হবে।

কাজটা বেআইনী। রিস্ক নিয়ে থাকতে দিলাম নিখিলবাবু। বউ বাচ্চা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কলকাতা থেকে ওপরের কেউ এলে কিন্তু খালি করে দেবেন।

নিশ্চয়।

নতুন ঝকমকে বাড়ি। হাটন রোড থেকে বেরিয়ে কল্যাণেশ্বরী যাবার পথে এই পি ডবলু ডি কলোনি। আশপাশের বাড়িতে লোক এসে গেছে। পর্দা ঝুলছে। রাজিয়ার ভালই লাগছিল। সবই নতুন এখানে। কুঁজো, স্টোভ, থালা, দুধের কৌটো, চায়ের প্যাকেট, চিনির মোড়ক।

দুধ খেয়ে বেবি ঘুমিয়ে পড়তে ওরা দু'জন খেয়ে নিল। ভাতে ভাত—মাখন, আলু সেদ্ধ। এখানকার নাইট গার্ড যা পেরেছে বাজার করে দিয়েছে।

এখানে তুমি বদলি হয়ে আসতে পারো না?

সেই চেষ্টাই করবো কেয়া।

এমন হট করে চলে এলাম। তোমার জন্য রাঁধবো বলে তিনশো মাংস এনেছিলাম।

আজকাল মাংস আমার ভাল লাগে না কেয়া। সাধারণ নিরামিষ রান্নাই ভাল লাগে।

আমি যে চলে এলাম—এ মাসে মাকে টাকা পাঠাবো কি করে?

এ মাসটা ভেবো না। আমি চালিয়ে দেব।

এসব জায়গায় আমি ফের ও ব্যবসা শুরু করতে পারবো না।

পাগল হয়েছো নাকি। ও ব্যবসা আর কোনদিন তোমার করতে হবে না।

কেয়া নিখিলের মুখে তাকালো। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই বলল, খোদাতালা আল্লার মত রহিম তোমার—

মানে?

তোমার শরীরে দয়া ধর্ম আছে।

ঘুম এসে একসময় ওদের দুজনকে বিছানায় পেড়ে ফেলল। পরদিন ঘুম ভাঙলো আগে রাজিয়ার। বেশ গোছানো ফ্ল্যাট। টু রুম। ডাইনিং স্পেস। সামনে ভেতরে দুটো বারান্দা। পরিষ্কার বাথরুম। ছোট একটুকরো উঠোন। কম্পাউণ্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা সবটা। ইচ্ছে করলে আম কাঁঠালের গাছ লাগানো যায়। পেঁপে গাছ তো স্বচ্ছন্দেই হতে পারে।

আজ কি বাজার করবো?

রাজিয়া বলল, যা তোমার পছন্দ।

তুমি তো মাংস ভালবাস।

গোস্ত আনতে পার। কিন্তু আমি তো আর বড গোস্ত খাই না।

কবে থেকে?

অনেকদিন। খাসি এনো। বেবির জন্য মেটে। কোথাও পাকাপাকি বাসা হলে মেয়েটাকে একটা স্কুলে দেব।

রাজিয়া এসব কথা বলছিল আর বিনা আয়নায় আন্দাজে কপালে সিদুঁরের টিপ দিচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল নিখিল। ঠিক এই সময় রাজিয়া বলল, একখানা আরশি এনো তো বাজার থেকে।

আয়না ?

ওই হ্যাঁ—আয়না বলে যাকে।

জানো কেয়া—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়ার পর যে-ই একটু ভাব জমলো—আগে যাও বা দু'একদিন শুয়োরের মাংস খেয়েছি—তারপর আর একদিনও খাই নি।

দেখো এত ভালবাসা ভাল নয় কিন্তু। শেষে না খাট্টা হয়ে যায়—বাঙালীবাবুদের এই যে—

ও কি বলছো কেয়া ? তুমিও তো বাঙালী।

কি করে ? আমরা তো মুসলমান। তোমরা বাঙালী।

ভুল কেয়া ! ভুল ! তুমিও বাঙালী। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে তোমার নাম হয়েছে কেয়া দত্ত।

সে তো জানি। লেকিন নমাজ তো পড়তে পারবো ?

এ কথা বলছো কেন ? তোমার কোন ইচ্ছেটায় বাদ সেধেছি কেয়া ?

দ্যাখো। আমার নমাজ পড়তেও ভালো লাগে। আবার সিঁদুর পরতেও ভাল লাগে।

যা মন চায় তাই করবে। কেউ বাধা দেবে না।

ভাবছি বেবির মত তোমার জন্যে শিবপুজো ভি করবো। বেবি তো আর সালাম বলে না। বলে—নমস্তে।

তোমার যা ইচ্ছে তাই করবে। এটা রাজাবাগান নয়। এখানে কেউ তোমায় বাধা দেবে না।

বিকেলে মাসিক বারো টাকা ভাড়ায় একখানা চৌকি এসে গেল। সেই সঙ্গে কেয়ারটেকারের ঘর থেকে একটা টুল এনে জুড়ে দিতে

দিব্যি বড় বিছানা হল। পাশের বাড়ি খেলতে গিয়েছিল বেবি। ওদের কাজের লোক কোলে করে ফেরৎ দিয়ে গেল।

বেবিকে নিয়েই কথা হচ্ছিল দু'জনে। এতদিন লোক এলে বেবি চালান হয়ে যেত মাসির একফালি ঘরে। বেলি বেঁচে থাকতে বেলি—তারপর রাজিয়া—যে যখন ফাঁকা হয়েছে—তখনই বেবি গিয়ে মা বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছে। নয়তো মাসির ঘর। উপায় নেই। কালীঘাটের মত জায়গায় তবু বাচ্চা রাখা যায় কাছাকাছি। অন্য জায়গা হলে কি হত? এই তো দস্তুরী। লখার মাঠ—সোনাগাছি সব জায়গাতেই।

নিখিল বলল, আমি কাল ভোরে তমলুক যাচ্ছি। কোনরকমে অফিস করবো। বদলির দরখাস্ত দেব। তারপর রওনা হব ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যাবে। তাই ট্রেন না পেলে বাস ধরবো। বাস না পেলে লরি—

আমি একা থাকবো সারাদিন?

সবই তো কেনাকাটা করা আছে ক'দিনের। তোমার ঘর থেকে বেরোতেই হবে না কেয়া—

তা না হয় না বেরোলাম।

কোন ভয় নেই। জায়গাটা নিরাপদ। সবাই জানে আমার ফ্যামিলি নিয়ে এসে উঠেছি। হুট করে অবিশ্যি কেউ বেড়াতে আসতে পারে।

কে?

ধরো পাশের বাড়ির মহিলা আসতে পারেন। গল্প করতেই আসতে পারেন।

কি গল্প করবো? আমি তো কোনদিন ঘর সংসার করিনি।

বেশি কথা বলবে না। শুনবে শুধু।

ওরা কথা বলছিল আর দেখতে পাচ্ছিল—বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে

একজন এগিয়ে আসছেন। কাছাকাছি আসতেই পটাং করে উঠে দাঁড়াল রাজিয়া। বিষ্টু—

হাসতে হাসতে বারান্দায় উঠে এল কালীঘাটের বিষ্টু। তোরা হারামি ভেবেছিলি হারিয়ে যাবি?

ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল নিখিল। কী করে এলে? খবর দিল কে?

এমন কিছু কঠিন নয়। কালীঘাটের দেবেনের ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশন এসেছ। গাড়িতে বসেই বলেছো আসানসোল যাবে—ভাগ্যিস দেবেনদার সঙ্গে দেখা হল। মাসী তো চিন্তায় মরে। এক হাট খদ্দের বসিয়ে রেখে এভাবে আচমকা কেউ চলে আসে! না আসতে আছে? কত বড় লোকসান বলতো নিখিলবাবু—

তুই চলে যা বিষ্টু।

রাজিয়ার এ কথায় ভ্রূক্ষেপও করলো না বিষ্টু। যাবার জন্যে আসিনি। বুঝলি—

তখনো নিখিল জানতে চাইল, এখানেই যে পাবে বুঝলে কি করে?

বাঃ। তুমি পি ডবলুর বাবু। সেটা তো জানি। তারপর শহরে নেমেই রিক্সাওয়ালাদের খবর করলাম। তারা এনে গেটে নামিয়ে দিল। ব্যস্—এটাই তো পি ডবলুর কোলোনি।

তোর পায়ে পড়ি বিষ্টু। এই নে আমার হাতের বাউটি। তুই ফিরে যা। গিয়ে বলবি—পাসনি আমাদের। খুঁজে হয়রান হয়েছিস শুধু—

চুক্ চুক্ করে শব্দ করলো বিষ্টু মুখে। তারপর বলল, আমায় কুত্তার মত ঠুকরে দূরে ফেলে দিলি—একবারও তো আমার কথা ভাবিস নি সেদিন—কাল ভোরেই কলকাতার ট্রেন ধরবি। মাসীর পাওনা গণ্ডা পাই পয়সা বুঝিয়ে দিবি—

রাজিয়ার পাস করা মুখ খুলে গেল। হামাদের গতর ভাঙানো

হিসাব। মউসি আর সাতাইশ টাকা পায়-গতর খুলে খুলে শুধেছি --

এই চুপ--বলে নিখিল তার বিয়ে করা বউ কেয়াকে থামালো। পাশের বাড়ির জানলা বোধহয় খুলে গেল। নিজের ঘরেরটা বন্ধ করে নিখিল বিষ্টুর মুখোমুখি দাঁড়াল। এই বুনো কুকুরকে সরিয়ে দিয়ে রাজিয়া সুলতানা তাকে ডেকেছে—এর সঙ্গে দাঁতে দাঁত ঘষে লড়াই করার কথা তার। বিষ্টুর চোখের সঙ্গে চোখ—নাকের সঙ্গে নাক প্রায় এক করে চাপা অথচ ধমকানির গলায় নিখিল বলল, সাতাশ টাকা নিয়ে যাও। মাসিকে দেবে।

আরও সব পুরানো হিসাব আছে। তার ফয়সালা হয় নি।

রাজিয়া বলল, কত পুরানো? কিসের ফয়সালা?

ঘরভাড়া ক্লিয়াব করিসনি সব। চোলাইয়ের দাম পাব।

নিখিল ধমকে উঠলো। চেঁচাবি না। এটা ভদ্রলোকের পাড়া।

খুব ঠাণ্ডা গলায় চেপে চেপে বিষ্টু বলল, আসল হিসাবই তো হয় নি। বেলির বাচ্চা তুই নিয়ে আসিস কোন্ সুবাদে? ও তো কালীঘাটের মেয়ে—

তার জবাব তোকে দেব না। আমি বেবির মা। মা যা না করে—তাই করি। আমার কাছে থাকবে না তো কি মাসির কাছে থাকবে?

মাসি বাচ্চা ভি ফেরৎ চেয়েছে।

যদি না দিই।

রাজিয়ার এ কথায় নিখিল ভয় পেল। হাজার হোক এসব বাড়ি তার অফিসেরই খালি কোয়ার্টার। এখানে হইহুজ্জোদ মানে প্রেসটিজ নিয়ে টানাটানি।

গা জোয়ারি করতে হবে রাজিয়া—

এ কথায় নিখিলের মাথার ভেতর আগুন ধরে উঠলো দপ করে।

কি বললে? গায়ের জোর দেখাবে? তাহলে আজ ফিরে যেতে হবে না বিষ্টু।

তাহলে আর কি করবো নিখিলবাবু। তোমাদের এখানকার রেওয়াজ যা-তাতে চেঁচাবো। তাতে যদি কোন সুবাহা হয়।

চেঁচালে যে বেবি জেগে উঠবে।

তা উঠলে উঠবে। ও বাচ্চাব মালিক তো বাজিয়া নয়।

বাজিয়া ওকে মায়ের মত বড় করছে।

সে ফয়সালা কলকাতা গিয়ে দু'জনে মাসির সঙ্গে করে লিন না। সব হাঙ্গামা চুকে যায়।

ও বাচ্চা আমরা দত্তক নিয়েছি বিষ্টু।

কবে নিলে? কার কাছ থেকে নিলে?

কেন? মাসি এই বেবির দাদি নাকি!—বাজিয়াব গলা একেবারে পটাং করে উঠলো।

বিষ্টু বলল, কলকাতা চল— তখন দেখা যাবে বেবিব কে দাদি কে নানি? আব কে ফুফি!

চীৎকার চেঁচামেচি। লোকলজ্জার ভয়ে তখনকাব মত থামতে হল নিখিলকে। সে-ই থামালো রাজিয়াকে। বিষ্টুকে বলল, মশা আছে ভাই। কষ্ট কবে শুতে হবে—

একটা মাদুব দিন। তাতেই হবে। এটা তো একদম নতুন বাড়ি। আব নতুন বাড়ি পেয়ে একদিনে সংসাব ভি পেতে ফেলেছেন!

॥ এগারো ॥

বিষ্টু মাদুর পেয়েই নাক ডেকে ঘুমোতে লাগল। যেন পৃথিবীর কোথাও কিছু উনিশ বিশ হয় নি। সবই ঠিকঠাক চলছে।

কিন্তু পাশাপাশি মশারির ভেতর শুয়েও রাজিয়া বা নিখিল-কেউই চোখের পাতা এক করতে পারছিল না। আবার কথাও বলতে পারছিল না। পাছে তাদের মাঝখানে অয়েলক্লথে শোয়ানো বেবির ঘুম ভেঙে যায়।

ওদের দরজার বাইরে নোটিশ বা পাহারার মত বিষ্টু। তবে ঘুমন্ত। রাজিয়াব মনে পড়ল—ওই শয়তানটার সঙ্গে একবার মাস খানেকের জন্যে সে স্বামী স্ত্রীর মত ছিল। তখন রাজিয়াকে চাকু মাবার ভয় দেখাতো খুব। এখন বেশি রাতে ট্রেন নেই বলে। ঘুমোচ্ছে। বেবি আর রাজিয়াকে নিয়ে কাল ভোরের ট্রেন ধরবে।

আলো জ্বালানো ঘরে সাদা মশারির ভেতর নিখিলের মনে হল—বাজিয়া ঠিক বউয়ের মতই বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছে। যেমন ভদ্দরলোকদের বউয়েরা করে থাকে।

কাল ভোরেই ফেরার গোড়ায় বিষ্টু কালান্তক হয়ে উঠবে। বাজিয়ার স্বামী হিসেবে সে এখনো জানে না—এই বিষ্টুকে কী কবে ওখান থেকে সরাবে। এমন ভাবেই সরাতে হবে—যাতে পরে যেন কোন সোরগোল না ওঠে। লোকলজ্জার কারণ না হয়।

ভোরে উঠেই বাজিয়াকে বিষ্টু বলল, এই কি জীবন! সারা সপ্তাহ খেটে খুটে কোথায় শনিবার বেস খেলবি—নেশা করবি—তা নয়—সারাটা জীবন একই লোকের খাটে শুবি! এ কি ভাল রাজিয়া?

রাজিয়া কোন জবাব না দিয়ে বেবিকে চান করালো। তারপর নিজে চান করে এসে স্টোভ জেলে প্রথমে মেয়ের দুধ—তারপর সবার জন্যে চা করলো।

চা খেতে খেতে বিষ্টু বলল, আমাকেই যে তোব পছন্দ হতে হবে—তার কোন মানে নেই। হরেক লোক আছে। হরেক লোক আসবে। এই তো বয়স। এখন সিরিফ মজা লুটবি।

ওদের রওনা হতে হতে দুপুর হল। পৃথিবীর তাতে কোন

হেরফের হল না। আসানসোল প্ল্যাটফর্মে রাজিয়া আরেকবার বলল, তুই ফিরে যা বিষ্টু। আমার জীবনটা মাটি করে কী লাভ তোর? যার যা পাওনা গণ্ডা লিখে দিচ্ছি ব্যাংকের কাগজে। ওখানে গিয়ে ভাঙিয়ে নিলেই হবে।

যা ভাঙাবার ওখানে বসে তুমি নিজের হাতে ভাঙিয়ে দেবে!

এক সময় ট্রেন ছাড়ল। বিরক্তিকর প্যাসেঞ্জার। কালীপাহাড়ি স্টেশনে ঢুকতে বিরাট একটা গড়খাই। তাতে কোন জল নেই। সেই শূন্য গর্ভ গর্তে ইঞ্জিনের আওয়াজ লাফিয়ে পড়ে বিকট শব্দে হাঁপাতে লাগল।

রাজিয়া সুলতানা ভাবলো, লাফিয়ে পড়ি গর্তে। যা হয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—বেবি আছে। আছে নিখিল। আমি তো আর একা নই। আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি কেয়া দত্ত যে—

সন্ধ্যার মুখে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল আদি সপ্ত গ্রামে। বিরাট বিরাট প্ল্যাটফর্ম পাশাপাশি। উল্টোদিকে কী একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। স্থানীয় কোন মেলা আছে হয়ত। লোক উঠছে হুড়হুড় করে।

সেই ভিড়ের ভেতর নিখিল কেয়ার হাত ধরে টানলো। চোখে তাকালো। তারপর দু'জনে ভিড়ের উল্টোদিকে মুখ করে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। গা ঘষে বেবিকে নিয়ে একরকম হেঁচড়ে।

উল্টোমুখো গাড়িটা ছাড়ো ছাড়ো। নিখিল আর কেয়া ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠতেই ছেড়ে দিল। বিষ্টু তখনো ফেলে আসা গাড়ির ভিড়ের ভেতর মাথা তুলে দেখতে চাইছিল—রাজিয়া জায়গা বদলে ঠিক কোথায় বসলো। মাথা তুলেও কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না বিষ্টু।

নিখিলদের গাড়ি স্পিড নেওয়ায় জানলা দিয়ে বেশ হাওয়া এসে ঢুকতে লাগল।

আপনার বাবা তো বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন ?

তা ছিলেন। কিন্তু তাতে হোলটা কি !

আপনার বাবার নামে একটা পুরস্কার দিন। ফি বছর একজন কৃতী গবেষক সেই পুরস্কার পাবেন।

দিলাম।

এক লাখ টাকা পুরস্কার দিতে আপনার আটকাবার কথা নয়।

এখন নয়। কিন্তু এক সময় এক টাকাও ফেলনা ছিল না। বুঝলে। তখন ট্রামের মান্থলিখানা পকেটে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরতাম। বলতাম—কৃপাসিন্ধুর এই তালমিছরি মায়েদের হাতে তুলে দিন। দেশের কোন বাচ্চার আর কফকাশি হবে না।

সব ওষুধের দোকানে গিয়ে বলতাম। ওরা ভাবতো আমি কৃপাসিন্ধুর ছোট ছেলে নয়নসিন্ধু রায়।

তা এখন তো আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন। ছেলে বলছে—নাতি বলছে আর আপনার অফিসে বসে লাভ কি ? বরং আপনার বাবা কৃপাসিন্ধু রায় কী সামান্য পুঁজি নিয়ে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের বীজ বুনে গিয়েছিলেন—দেশের জন্য কী করেছিলেন—কত লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন—সে সব কথা গবেষণা করে একখানা বই লেখা হোক। লোকে জানুক সেই দেশ-কর্মীর কথা যাঁর স্বপ্নকে আপনি এই সত্তর বছর ধরে একনাগাড়ে খেটে বাস্তব জন্ম দিয়েছেন।

বলছো ?

আমি আপনার সামান্য কর্মচারী। আপনাদের বিজ্ঞাপন

বিভাগে তালমিছরি আর কৃপাসিন্ধু পাচনের কপি লিখি। আমার মনে হয় তালমিছরি আর পাচনের পেছনে যদি আপনার বাবার একটা ইমেজ—হ্যালো যুক্ত হয় তো আমাদের প্রোডাক্টেরই বিক্রি বাড়বে।

বিক্রি বাড়বে কি করে। প্রোডাকসন কোথায় হৃষীকেশ। তোমরা তো ওভারটাইম ছাড়া কাজে মনই বসাতে পারো না।

দরকার হলে দেবেন। আমাদের বাদ দিয়ে তো আপনার ব্যবসা নয়।

কক্ষনো নয় হৃষীকেশ। বাবা তো তালমিছরির বোরা মাথায় করে এক সময় দোকানে দোকানে গেছেন। তখনকার পুরনো হিতবাদী—বেঙ্গলীর পাতায় বিজ্ঞাপন দেখলে জানতে—বাবা এক গ্রোস তালমিছরির মাঝারি শিশি কিনলে পাইকারদের দু'খানা করে গামছা বোনাস দিতেন। এ বোনাসের কথা তিনি বিজ্ঞাপনেই লিখে দিতেন। তখন বাবার পাশে কারা ছিল?

কেউ না। আমার ঠাকুর্দা বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তিনি বিধবা বিয়েতে চটে গিয়ে রাধাকান্ত দেবের দলে ঢুকে পড়েন। তালমিছরির ব্যবসায় তাঁর তো ঘোর আপত্তি ছিল।

আপনারা দীর্ঘায়ুর বংশ।

তা বলতে পারো। আমি বাবার অষ্টম সন্তান। আবার শেষ সন্তানও বটে। তাঁর পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়সে আমি জন্মাই।

আপনারা এখন বয়স কত?

সাতানব্বই।

লোকে যে বলে—একশো দশ।

যারা ও কথা বলে—তারা আমায় জন্মাতে দেখেছে। যে কথা বলছিলাম। বাড়ী থেকে বাবা বেরিয়ে এলেন। বঙ্কিম পাশ দিয়ে গ্র্যাজুয়েট হলেন। আর আমার বাবা তাল গাছ জমা নিতে লাগলেন গাঁয়ে—সেটা বোধহয় সিপাহী যুদ্ধের বছর ছিল।

কি করে জানলেন?

পুরনো বাড়িতে খাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে বছর তিরিশেক আগে কয়েকখানা চিঠি দেখেছিলাম।

সেগুলো কোথায় ?

হারিয়ে গেছে হৃষীকেশ।

এই তো আপনাদের মুস্কিল। বাঙ্গালীর ইতিহাস বোধহয় নেই। কি হবে ইতিহাস করে। সবাই যে যার মত আলাদা মানুষ হয়ে যাচ্ছে। করও খোঁজ নেয় না কেউ। আমরা এই ফড়েপুকুরে আছি একশো তিরিশ বছর। এখানে এক সময় সবাই সবাইকে চিনতাম। এখন কেউ কাউকে চিনি না।

চিনবেন কি করে। আপনার চেনাশুনোরা কেউ আছে কি ?

তা অবিশ্যিই। কেউই তো নেই। ঘোড়ায় টানা ট্রাম উঠে যেতেই টাউন স্কুলে ঢুকলাম হৃষীকেশ। তখনকার বন্ধুদের সঙ্গে ট্রাম রাস্তায় গাদি খেলেছি একদিন। তাদের একজনকে মনে হয়, সেদিন গঙ্গার ঘাটে দেখলাম। মুখের আদলটা দেখে মনে হয়— থার্ড ক্লাসের রোল ইলেভেন-বিনোদ ঘোষ খুব বাঘের ডাক ডাকতো সংস্কৃত ক্লাসে—

কি করছিলেন।

গঙ্গার ঘাটে চোখ বুজে সন্ধে করছিল। যাক গিয়ে যা বলছিলাম তাতে ফিরে আসি। বাবার কর্মচারীরাই বাবার পাশে জেগে বসে থাকতেন সব সময়। তেমন কয়েকজনের নামও মনে আছে আমার। নীলুকাকা। জগন্নাথ দত্ত। কপালি জ্যাঠা। এরা বাবার মিছরি জ্বাল দেওয়া থেকে প্যাকিং দেখতো। বাবা তো শেষ বয়সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কেত্তন ধরলেন। দেশসুদ্ধ সবাই তাঁকে তখন ভক্তি বিদোদ বলে ডাকে। কৃপাসিন্ধু নামটা শুধু তালমিছরি আর পাচনের বোতলের লেবেলেই থেকে গেল।

আপনি বিশ্বভারতী, কলকাতা, যাদবপুর—সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবার নামে টাকা দিয়ে চেয়ার করে দিন।

কেন? ওখানে কি তালমিছরি জ্বাল দেওয়া শেখানো হবে নাকি?

তা নয়। ওঁর নামে বিখ্যাত বিখ্যাত লোক এসে গুরুগম্ভীর বিষয়ে বক্তৃতা দেবে। কাগজে বেরোবে। লোকে পড়বে। ভাববে—কৃপাসিন্ধুর তালমিছরিতে না জানি কি আছে। লাইন দিয়ে কিনবে।

অনেক বিখ্যাত লোক আসতেন আমাদের বাড়িতে। সবাইকে আমি দেখিনি। তেজবাহাদুর শপ্রু, মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু ওঁরা তো বাবার তালমিছরি খেতেনই। শোনা কথা দেবেন ঠাকুর—তাঁর বড় ছেলে দ্বিজুবাবু ওঁরাও নিয়মিত তালমিছরি খেয়েছেন। গান্ধীজীর নামে মাসে মাসে দু' শিশি আমিও নিয়মিত ওয়ার্ধায় পাঠিয়েছি।

রামকৃষ্ণ? বিবেকানন্দ? ওঁরা খেয়েছেন কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি? তা জানি না হৃষীকেশ। তবে বাবা যখন আমাদের ছোটবেলায় মিছরি ডিষ্টিল করার বিলিতি মেশিন বসালেন—তখন একদিন সিস্টার নিবেদিতা ভিজিট করেছিলেন। স্যার জগদীশ সঙ্গে করে এনেছিলেন ওঁকে।

কোন ফোটে আছে?

নাঃ!

ওঁদের দেওয়া কোন প্রশংসাপত্র?

এমনি ভাল বলে চিঠি দিতেন মতিলাল নেহরু। কিন্তু সে-সব চিঠি তো রাখিনি হৃষীকেশ। পুরনো বাড়ি থেকে কারখানা উঠে এল নতুন বাড়িতে। তখনই তো সব হারিয়ে যায়। ওই পুরনো বাড়িতে এক সময় বাবা-কাকারা আমাদের নিয়ে সংসার করেছেন। কলকাতায় এসে বালগঙ্গাধর তিলক একবার ওই পুরনো বাড়িতে আমাদের কারখানা দেখতে এসেছিলেন।

ছবি তুলে রাখবেন তো!

কোথায় ক্যামেরা তখন! গুচ্চের কাঠ আর কয়লা থাকতো। বড় বড় কড়াইয়ে সারাদিন জ্বাল হচ্ছে। আমরা ছোটোরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ি। তিনি এসেই পেটাতেন। এটাই ছিল ভাল মাস্টারের লক্ষণ। আর সাত বৌদির সংসার। সারা বাড়ি যেন গঙ্গার ঘাট।

নতুন বাড়িতেও তো পঞ্চাশ বছর হ'ল উঠে এসেছেন। তার বেশি। হৃষীকেশ। ওবাড়ি তৈরি থার্টিফাইবে। আমার নিজের হাতে করা। গান্ধীজীকে দিয়ে ওপেন করা। তখন এ আই সি সি হলে মোটা চাঁদা ধরে দিতাম। নতুন বাড়ি করে থার্টিফাইবে কলকাতার বাইরে এই বাগানটা কিনি। তারপর আস্তে আস্তে আশেপাশের জায়গা কিনে এই সিন্ধু গার্ডেন তৈরি হয়েছে। এই যে তে—মহলা বাড়ি একটা একটা করে ফলের গাছ বসিয়েছি। নাবি জমি দিঘি কেটে ভরাট করেছি। দিঘিতে মাছ ছেড়েছি। নৌকো ভাসিয়েছি। একবার সে নৌকোয় সুভাষ এসে চড়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দু'দিন আমার বাড়ি কাটিয়ে যায় এখানে। ঠিক ত্রিপুরি কংগ্রেসের আগে।

পুরনো বাড়ির সামনে নতুন বাড়িও তো পুরনো হয়ে যাবে।

কেন? কেন হৃষীকেশ?

বাঃ। আপনার ছেলে—আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনি যে আরেকটা বাড়ি তুলেছেন। সে বাড়িও তো কমপ্লিট হয়ে এল। মাটির নিচে তিনতলা। সেখানে মডার্ণ প্ল্যাণ্ট বসবে। ওপরে দশতলা।

কুসুমসিন্ধুর বাড়ি?

হুঁ। ও বাড়িতে কারখানা, অফিস ওঠে গেলে আপনার বানানো নতুন বাড়িকে তো সবাই পুরনো বাড়ি বলবে।

তাও তো বটে হৃষীকেশ। এটা তো ভাবি নি। দ্যাখো।

—আমার বাবা কৃপাসিন্ধু রায় রাজা দিগম্বর মিত্তির—চেনো?

কোত্থেকে চিনবো !

রাজা দিগম্বর মিত্তির মাইকেল বিলেত গেলে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দেখার ভার নিয়েছিল। কথা ছিল মাইকেলকে সময়মত টাকা পাঠাবেন। তা তো ফেল করলেন। যে জন্যে মাইকেল বিদেশে বিপদে পড়েন, তা বাবা রাজা দিগম্বর মিত্তিরের কাছ থেকে জায়গাটা লিজ নিয়ে সেখানে সুরকি আর ঘেঁষ দিয়ে দোতলা বাড়িটা তোলেন। এই বাড়িই ছিল তাঁর নতুন বাড়ি। ওখানেই জয়েন্ট ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেন। মিছরি জ্বাল দিতেন। আবার ও বাড়ি থেকেই তিনি ছোট লাটের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। সাহেবরা বিলেতে বসে ঘোঁট পাকালো বাবার মিছরি চলালে ওদের শিশিভর্তি কফ সিরাপ চলে না। ছোটলাট ডেকে পাঠলেন বাবাকে।

আজ উঠি। অনেকটা পথ যেতে হবে। এমন জায়গায় সিন্ধু গার্ডেন বানালেন !

কেন। পরিষ্কার বাতাস। কোন গোলমাল নেই। এখানে বসে আমার ছোটবেলায় প্রিয় বইগুলো পড়ি। আচ্ছা হৃষীকেশ —আমায় এক কপি 'দারোগার ডায়েরি' জোগাড় করে দিতে পারো ?

ওই বইয়ের নামই শুনিনি।

তা শুনবে কোত্থেকে ! ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগের ছেলে, বুড়ো সবারই ও বই ছিল হট ফেভারিট।

হৃষীকেশ—হৃষীকেশ বসু—বয়স তেতাল্লিশ—কৃপাসিন্ধু তালমিছরির বিজ্ঞাপন একজিকিউটিভ এতক্ষণ সিন্ধু গার্ডেনের ভেতর বিরাট তে-মহলা বাড়ির একতলার ঢাকা বারান্দায় বসে নয়নসিন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল। দেওয়ালে ঘেরা প্রায় দেড়শো বিঘার সিন্ধু গার্ডেন। এখন বেলা প্রায় বারোটা। রোদে আরাম। মাঘ মাস। নয়নসিন্ধুর মাঠ থেকে ধান কেটে চাষীরা ফিরছে।

মাথায় ধানের বোঝা। তার ঝুরুর ঝুমুর আওয়াজ। এল টাইপের বিরাট বারান্দার আরেক দিকে একটা কালার টিভি খোলা। গাভাস্কার ছক্কা মারলো। তার সামনে কয়েকটা ধানের বস্তা। ধানের বস্তার পাশে চাষী বাড়ির কচিকাঁচারা অবাক চোখে ক্রিকেট খেলা দেখছে। যে খেলার তারা কিছুই বোঝে না। সিন্ধু গার্ডেনের বাইরে হাইওয়ে দিয়ে বাস যাচ্ছে বনগাঁয়। ফিরছে কলকাতায়। তাদের ইলেকট্রিক হর্ন।

হৃষীকেশ বুঝতে পারলো না—বাড়িতে আর লোক আছে কি-না। এটা তো ঢাকা বারান্দা। তাকে এগিয়ে দিতে সাতানব্বই বছরের নয়নসিন্ধু রায় সেই বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তার চেয়ে নয়নসিন্ধু মাত্র চুয়ান্ন বছরের বড়। নয়নসিন্ধুর কলকাতা, লখনউ, কানপুর, এলাহাবাদ, জামসেদপুর কারখানা ধরলে মোটমাট চার হাজার কর্মচারী। এই চার হাজারেরই একজন হৃষীকেশ। তাকে এগিয়ে দিতে নয়নসিন্ধুর সিঁড়িতে এসে না দাঁড়ালেও চলতো। বয়স-মানসম্মান-ক্ষমতা-সব দিকেই নয়নসিন্ধু তার চেয়ে অনেক—অনেক বড়।

একবার সন্দেহ হলো—নয়নসিন্ধু বোধ হয় জানেন না—তিনি কতটা বড়। শীতের রোদের নরম আরাম নয়নসিন্ধুর গায়ের গরম শাল থেকে ঝরে পড়েছে যেন। সাতানব্বই বছরের পুরনো পায়ে একজোড়া সাধারণ স্যান্ডেল। গায়ের ফতুয়াটি উলিকটের। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল হৃষীকেশ। অর্ধেক নামিয়ে দেওয়া পর্দার মতই দুই চোখেই দু'টি পাতা অর্ধেক নেমে এসে আজ তিরিশ বছর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। চোখ বুজতে পারেন না নয়নসিন্ধু। ডান চোখে জল কাটছে সব সময়। একটু বা পিচুটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সিবা কোম্পানির নেমতন্ন রাখতে সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন সিবার চেয়ারম্যান নয়নসিন্ধুকে নিয়ে বরফ ঢাকা সুদূর পাহাড়ি এলাকায়

যান। —হিমবাহ দেখতে। ঠাণ্ডায় তখন চোখ দু'টো জখম হয়। তারপর বয়স। এখন অমন চোখ খোলা রেখেই ঘুমোন নয়নসিন্ধু। ঘুম এলে বড়জোর একখানা কালো সিল্কের রুমাল চোখের ওপর ফেলে রাখেন।

ঠাণ্ডায় জখম চোখ দেখে নয়নসিন্ধুকে বোঝার উপায় নেই কোন। মুখ হাসি। সরু ঠোঁট। টিকালো নাক। চিবুকের নিচে কোন মেদ জমেনি। বা জমলেও তা শুকিয়ে এসেছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে।

কাছেপিঠে কোথাও কেউ নেই। দেওয়ালে নয়নসিন্ধুর বউয়ের ছবি। তিনি নেই তাও বিশ-বাইশ বছর হয়ে গেল। ছেলে কুসুমসিন্ধু সকাল সকাল চানটান করে সেই যে গাড়ি নিয়ে বেরোন—সারাটা দিন কলকাতায় থেকে ফেরেন রাতে। নাতি-নাতনিদের বিয়ে সব সারা। তারা সবাই থাকে সাউথ ক্যালকাটায়। সব আট-দশ তলার ফ্ল্যাটে।

একতলা রসুইঘর আলাদা। তার সামনে একটি হরিতকি গাছ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নিজেই বাতাসে পাতা মেলে দিয়ে কাঁপছে। গাছতলায় একজন লোক হাতাখুন্তি বের করে দিল।

হৃষীকেশ ফস করে বলল, আপনার কত টাকা আপনি জানেন।

না। তুমি জানো নাকি?

আমরা জানবো কোত্থেকে।

আমাদের খরচ কত জানো? মাস গেলে মাইনে দিতে হয় তোমাদের। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস, মেডিকাল—সব টাকার ব্যবস্থা করতে হয় হৃষীকেশ। এর মধ্যে আছে তোমাদের গো স্লো, স্ট্রাইক। কাজের সময়টা বসে থেকে পরে ওভার টাইমে কাজ করা। সবই তো জানো।

আপনার কত কর্মচারী জানেন?

নাঃ। এখন আর জানি না। বছর চল্লিশেক আগে একবার

কলকাতার কারখানায় আটচল্লিশজনকে স্ট্রাইকের পর ছাঁটাই করতে হয়েছিল। তখন সব জানতাম। এখন তো আমায় সব জানানো হয় না। এলাহাবাদে একবার প্ল্যাণ্ট বন্ধ রেখে দিই পাকা এক বছর। তাতে তিনশোর মত ওয়াকার ছেড়ে চলে যায়।

এখন হলে পারতেন ?

অসম্ভব।

আপনার হাতে কৃপাসিন্ধুর তালমিছরির ব্যবসা দশ গুণেরও বেশি। দিন না আপনার বাবার নামে একটা গবেষণা বৃত্তি। যাকে বলে একটা স্কলারশিপ। বা প্রাইজও দিতে পারেন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রর সঙ্গে আপনার বাবার ছবি ছেপে বিজ্ঞাপন করবো—

যুগজয়ী কপালকুণ্ডলার স্রষ্টার সহপাঠীর অমর সৃষ্টি।

ভাল বলেছো তো হৃষীকেশ। বাবার তালমিছরি কপালকুণ্ডলার মতই টিকে আছে বাজারে। কত তালমিছরি এই একশো বছরে এল গেল। আমিই তো দশ-বারো রকমের তালমিছরি দেখলাম। তারা এল। আবার চলেও গেল।

তাহলে কৃপাসিন্ধু প্রাইজ চালু করছেন ?

নাঃ। এক লাখ টাকা পেয়ে নয়ছয় করবে। যাবে প্রাইজ দেব তার মাথাটি খাওয়া হবে। কি দরকার। বেচারা এমন তবু করে-কম্মে খাচ্ছে।

আমি চলি আজ।

আমার লাইব্রেরি দেখবে না ?

আরেকদিন এসে দেখবো।

তাহলে আম গাছগুলো দেখে যাও। সব কলমের আম। ল্যাংড়া, কোহিতুর—আবার তো আসছি। তখন দেখবো। আজ আসি।

॥ দুই ॥

এই যে টেলিফোনটা দেখছো—এটা তুললেই বাবার সঙ্গে কথা বলা যায়।

হৃষীকেশ এসেছিল সিটি অফিসে। ফাইলপত্তর নিয়ে। নার্দার্ন টেরিটোরির হিন্দি কাগজগুলোয় কৃপাসিন্ধু তালমিছরির ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন কেমন যাচ্ছে তাই দেখাতে।

কাঠের প্যানেল লাগানো ঢাউস ঘর। এয়ারকণ্ডিসন। বাইরে এখন চৈত্র মাসের জ্যান্ত বি-বা-দি বাগ দপ দপ করছে। ভেতরে পেল্লাই এক হর্সসু টেবিলের একদম সেণ্টারে দশাসই কুসুমসিন্ধু বসে। নাভি থেকে মাথা অব্দিই লোকটা তিন ফুটের বেশি হবে। পা থেকে মাথা অব্দি ধরলে সওয়া ছ' ফুট লম্বা। বছর পঁয়ষট্টি বয়স। দেখলে বোঝার উপায় নেই। এখনো দিনে তিনশো বৈঠক আর তিনশো বুকডন দিয়ে থাকেন কুসুমসিন্ধু। তাই তো শুনছে হৃষীকেশ। রীতিমত পেটানো শরীর। খদ্দরের কলার তোলা পাঞ্জাবি। নিচে চাপা পাজামা।

হৃষীকেশ বসু বলল, এই দশ মাইল রাস্তা হট লাইন বসানো?

হুঁ বাবাই ব্রিটিশ আমলে গভর্নরকে বলে এই ব্যবসা করে নেন। তখন ইংরেজদের এক কথায় সব হোত। আমরা কংগ্রেসকে চাঁদা দিয়েছি—আবার ব্রিটিশ ওয়ার ফাণ্ডেও চাঁদা দিতাম। কত ব্যাপারে বাবার সঙ্গে কথা বলতে হয়। তাঁর পরামর্শ লাগে এখনো। মিছরি কনফেকশনারি জগতে বাবা একজন লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। আর আমার কাছে কে জানো?

না।

আমার কাছে লিভিং গড্।

হৃষীকেশ মনে মনে বলল, তা তো বটেই।

কুসুমসিন্ধু বলল, দ্যাখো বাবা এখনো নিয়ম করে বেলা দশটায় অফিসে যান। পাঁচটা অব্দি থাকেন। আমার ছেলে অলকাসিন্ধু তোমাদের জেনারেল ম্যানেজার। সেও বেলা দশটায় অফিসে যায়। শুধু যাই না আমি। আমি আসলে একটি রাসকেল। ভাগ্যবান রাসকেল! নয়ত এমন বাবা—এমন ছেলে পাওয়া যায়? আমি বেলা বারোটা-একটায় এ অফিসে এসে দাবা খেলি। বিকেল পড়লে দাবার কোট মুড়ে বাড়ি ফিরি। বাই দি ওয়ে—তুমি দাবা খেলতে পারো?

না। কোনদিন শিখিনি।

শিখে রাখবে তো। শেখা থাকলে তোমার সঙ্গে বসে খেলা যেত একহাত। যাক বিজ্ঞাপনগুলো দেখাও।

হৃষীকেশ মেলে ধরলো। সব ক'টা বিজ্ঞাপন দেখে বলল, কোন বিজ্ঞাপনেই দেখছি মেয়েছেলে নেই। কেন? তালমিছরি তো মেইনলি বাচ্চারা-বুড়োরা খায়।

মেয়েরা খায় না কে বলল তোমায়? এই তোমার বুদ্ধি।

বয়স্কা বুড়িরা খায়।

তাই বলে তাদের ছবি দিও না বিজ্ঞাপনে। অল্পবয়সী মেয়ে, বউরা তো তালমিছরি ফুটিয়ে খেতে দিতে পারে—

তা পারে।

তাহলে তাদের ছবি দাও। ভাল ফিগারের মডেল নিয়ে তাদের বড় সাজাও। সাজিয়ে মিছরি ফোটানোর প্যান হাতে ছবি তোলো। দরকার বুঝলে দু-তিন মিনিটের স্যাড ফিল্ম তোলাও। কি বলছি বুঝতে পারছো? বউদির বোন—কলেজ গার্লও সাজাতে পারো মডেলদের। বুঝেছো?

বুঝেছি।

এই তো চাই। তুমি শার্প ব্রেইনের ছেলে। তুব সব বুঝবে। আমি চাইছি কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি নিয়ে বিজ্ঞাপনে কিছুটা

সফট্ পর্ণো মেলানো হোক। আজকাল বড় মেয়েরাই তো বাজার-হাট করে। ওই বিজ্ঞাপন দেখলে তারাও চলবে। কি বল?

অ্যাপ্রুভ করবেন?

ঠিক বলেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান কি?

বাবাকে দেখাবার দরকার নেই। তাঁর এখন বয়স হয়েছে। ওঁকে টেনশনে ফেলা উচিত হবে না।

কিন্তু চেয়ারম্যান যে পুরনো লেবেল আঁকড়ে আছেন। বলেছেন—মান্ধাতার আমলের ওই লেবেল দেখেই খদ্দের আমাদের চেনে।

খদ্দের পাল্টাচ্ছে। ওই লেবেলের খদ্দেররা তো কবেই মরেহেজে গেছে। এখনকার খদ্দের তো এখনকার মত লেবেল চায় এই নিয়ে মারকেট সারভে করিয়ে নাও না।

বেশ তো।

যতদিন না সার্ভে রিপোর্ট পাচ্ছো—ততদিন বোতলে পুরনো লেবেল থাকুক। আর বিজ্ঞাপনে ওই সফট্ পর্ণোর ফরমুলা ফলো কর।

এয়ারকণ্ডিশন ঘর থেকে রাস্তায় নেমে কড়কড়ে রোদের ভেতর পড়ল হৃষীকেশ অফিসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে। যাতায়াত গাড়িতে। ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয় সে। এই সামান্য তালগাছের দৌলতে এত কাণ্ড। কৃপাসিন্ধুর তালমিছরির গ্রস ব্যবসা বছরে প্রায় পঞ্চাশ কোটির।

অথচ যে তালগাছের জন্যে এত কিছু—সেই তালগাছ ক'টা লোক আর যত্ন করে লাগায়। বেশির ভাগ গাছই তো মানুষের চুষে ফেলে দেওয়া আঁটি থেকে জন্মায়। কিছু আঁটি বাদুড় খেয়ে ছড়িয়ে দেয়। আর খায় শেয়াল। তালতলার পাকা তাল নিশুতি রাতে শেয়াল এসে খায়।

সেই তালগাছের জটা চেঁছে রস ধরা হয় কলসীতে।

কিছু খায় তাড়িতে। বাকিটা গুড়ের লাইন ধরে। ওই রস ধরে নিয়ে প্ল্যাণ্টে চাপাতে হয়। তাই দানা বেঁধে মিছরি হয়।

এই মিছরির দৌলতে কৃপাসিন্ধুর তালমিছরিতে এক লোকের রুজি-রোজগার—তার গাড়ি চড়া। নয়নসিন্ধুর সিন্ধু গার্ডেন। কলকাতার বুক থেকে সিন্ধু গার্ডেন অব্দি কুসুমসিন্ধুর দশ মাইলের হট লাইন। আমাদের মাইনে।

ভাবলে সত্যি আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। মিছরি এ কি তোমার অপার করুণা। তুমি সব পারো মিছরি। কত লোহা বেচলে তবে পঞ্চাশ কোটি।

হৃষীকেশ বেরিয়ে পড়লে কুসুমসিন্ধু পাশের ঘর থেকে তরা প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডাকলেন, ফোন তুলে।

ঘরে এসে ঢুকলো সুধাংশু গুহ। ঢিলে-ঢালা জামা গায়। হাসি-খুশি মুখ। ডেকেছেন?

আয়। বসে যাই।

এই ফার্স্ট আওয়ারেই দাবা খেলতে বসে যাবেন।

কেন? তোর আপত্তি আছে? তুই আমাদের প্ল্যাণ্ট ফোরম্যান ছিলি। মিছরি জাল দিতিস—

আমি একজন কেমিক্যাল ইনজিনিয়ার।

ওই একই হোল। মিছরিও তো একটা কেমিক্যাল। তাই না?

হুঁ।

তোর মাইনেও পাচ্ছিস—মিছরিও জ্বাল দিতে হচ্ছে না তোকে। তোফা দাবা খেলে যাচ্ছিস আমার সঙ্গে। আবার কি চাই। অ্যালাউন্স পাস সবার চেয়ে বেশি।

তার বদলে আপনার হয়ে কত কাজ করি বলেন।

সে তো কিছু করতেই হবে সুধাংশু।

এবার একবার একটা রাউণ্ড দিয়ে আয়। কোথায়?

গৌহাটি, ভুবনেশ্বর, পাটনায়—ওরাও তো নিচ্ছে কৃপা-সিন্ধুকে।

দাবার কোট মেলে দিতে দিতে সুধাংশু বলল, নিতেই হবে। না নিয়ে ফসকে যাবার কোন পথ রাখিনি যে—

সবই তোর হাতযশ সুধাংশু। ওই জন্যে তোকে ভালবাসি। চেহারাটা অমন বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে কেন?

হবে না? ষাট তো হোল দু' বছর।

বার্ষট্টি হয়েছে তোর সুধাংশু?

হওয়ার তো কথা। আপনি যখন বঙ্গবাসীতে ফি বছর ফেল করছেন—তখনই ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে আপনার কথা শুনলাম।

কী নিয়তি বল তোর! সেই ফেলু বসের কাছে সারাটা জীবন চাকরি করে চলেছিস।

সাঁইত্রিশ বছর হয়ে গেল।

খেলা যতই জমতে লাগল—ততই কথাবার্তা কমে এল। এরপর শুরু এয়ারকুলারের একটানা ঝিম ঝিম শব্দ। কৃপাসিন্ধ তাল-মিছরির পৃথিবী বি-বা-দী বাগের ওই কাঠের ঘরের ঠাণ্ডায় থেমে থাকলো।

খেলতে খেলতেই কুসুমসিন্ধু বলল, হ্যাঁরে সুধাংশু অফিসের ক্যান্টিনটা একটু দেখবি।

পারবো না। ওসব ঘুঘুর বাসায় হাত দিয়ে হাত পোড়াবো?

তুই দেখলে ঠিক হয়ে যাবে। রাত আটটার পর একখানা টোস্টও পাওয়া যায় না।

ওখান থেকে অফিস নতুন বাড়িতে উঠে না এলেও ও রকম অবস্থাই থাকবে। নতুন বাড়ি কবে হবে বলতে পারেন?

আর ছ' মাসের ভেতর কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখিস।

ততদিন ক্যান্টিন ও রকমই থাকবে।

দিনে হাজার তিনেক টাকা সার্বসিডি দিতে হয়। তুই একটু দ্যাখ।

পাড়ার ভেতর অফিস থাকায় পাড়ার বৌদিরা পনের পয়সায় ডিমসেদ্ধ কিনে নিয়ে যাচ্ছে সব। বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোফা ডিমের ডালনা।

বলিস কি রে!

বলেছি সত্যি জেনে রাখুন।

তুই তো আবার সত্যি ছাড়া কিছু বলিসই না?

ঠাট্টা করেন করুন। এ বান্দা সত্যি ছাড়া কিছু বলে না জানবেন!

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। একটু দাবা খেলা। এ কিন্তু সাধারণ দাবা নয়। এ খেলায় সুধাংশু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এগিয়ে যায়। গোড়ায়। তারপর এক সময় হিসেব কষেই হারতে থাকে। পাছে কুসুমসিন্ধুর সন্দেহ হয়। তাই ধাপে ধাপে হারতে থাকে সুধাংশু। সে জানে মালিকের সঙ্গে খেলায় কখনো জিততে হয় না। জেতা উচিত নয়।

খেলতে খেলতেই সুধাংশু এক সময় বলল, কেষ্টবাবুকে ধরার কি হ'ল? এটা একট ব্যাড প্রিসিডেন্স হয়ে থাকলো কিন্তু।

কুসুমসিন্ধু বলল, হুঁ।

রোজ কেষ্টবাবুকে নিয়ে দাবা খেলতে বসতেন। এদিকে দিব্যি তিন লাখ টাকা চোট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তা তো গেল। —বলেই চাল দিলেন কুসুমসিন্ধু, এবার সামলা—

তা সামলাচ্ছি। কিন্তু কেষ্টবাবুর মত চিটরা যদি শাস্তি না পেয়ে পার পেয়ে যায় তো আপনি অ্যাডমিনস্ট্রেশন রাখতে পারবেন? একটা নয়—দুটো নয়—তিন তিন লাখ টাকা মেরে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছু হ'ল না।

দাবার কোট ছুড়ে ফেলে দিলেন কুসুমসিন্ধু। কী সেই থেকে ভ্যান ভ্যান করছিস। খেলায় মন নেই। মেরেছে মেরেছে তিন লাখ টাকা। বেশ করেছে আমরা কী তোদের মত গরীব নাকি! বেশ করেছে মেরেছে।

ভেতরে ভেতরে খাবি খেল সুধাংশু। সে কৃপাসিন্ধুর মিছরিতে সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী। রিটায়ারের পরেও আছে। অত্যন্ত দায়িত্বশীল বিশ্বাসী কর্মচারী।

কিন্তু এ কোন বসকে সে সেবা করছে? যে কি না নিজের ভাল বোঝে না। বললে চটে যায়।

চটে কারণ, আমদানি এতই বেশি যে—দু' চার লাখ এদিক ওদিক হলেও কিছুই যায় আসে না। তবু-তবু একটা কথা থেকে যায়।

দু' চার হাজার টাকা এদিক ওদিক সুধাংশু করে থাকে। কিন্তু তাই বলে তিন লাখ টাকা? আর সে কথা মনে করিয়ে দিতে এত অপমানের ঝামটা।

মনে মনে গুমরে উঠলো সুধাংশু। সে আর কোনদিন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে না কিছু। ভুগুক। ভুগে যদি শিক্ষা হয়। বড়লোককে শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন।

॥ তিন ॥

ক্যালকাটা ক্লাবে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছিল ব্যবসা পরিচালনায়। মেয়র, মুখ্যমন্ত্রী দু'-জনই মঞ্চে উঠে বসবার সময় নয়নসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাল আছেন তো?

নয়নসিন্ধু বললেন, আর ভালো।

খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার, টি. ভি.-র ক্যামেরাম্যান এত

ফ্ল্যাশ বসাতে লাগল—আলোয়, গরমে—ডায়াসের ওপরেই নয়নসিন্ধু ঢলে পড়লেন। ভাগ্যিস অনুষ্ঠানের কর্তাদের একজন ধরে ফেলে তাঁকে।

শ্রোতাদের ভেতর বসেছিল অলকসিন্ধু। সে অস্ফুটে বলল দাদু। তার পাশেই বসেছিল নয়নসিন্ধুর সেক্রেটারি রঘুনাথ।

অলকসিন্ধুকে ঘাবড়াতে দেখে রঘুনাথ বলল ভয় পাবেন না। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

রঘুনাথ ভিড় এড়িয়ে ডায়াসে চলে এল। তার হাতের ডাকে ক্লাবের দুই বেয়ারা স্ট্রেচার হাতে একদম জায়গায়।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধুকে তাতে শুইয়ে নিয়ে বেয়ারারা ছুটলো, ক্লাব অ্যাম্বুলেন্স বলেই রেখেছিল রঘুনাথ। এক ফাঁকে বেলভিউয়ে একটা ফোন। সেখানেও নয়নসিন্ধুর নামে আস্ত একটি সুট বুক করা আছে। জ্ঞান হারাবার মিনিট পঁচিশেকের মাথায় দেখা গেল —বেলভিউয়ের দু'তলায় নয়নসিন্ধুকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার মাটির নিচে টেলিফোনের তার। সেই তার দিয়ে কুসুমসিন্ধু তালমিছরির পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে। বাবাকে বেলভিউয়ে দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ স্যার, রঘুনাথবাবু সভায় ছিলেন। উনিই সব ব্যবস্থা করেছেন।

ওকে—বলে ভেসে এল, বলে দেবো।

কাল সকালে ফুল পাঠিয়ে দিও বেলভিউয়ে আমার নামে। সঙ্গে বেলফুলের মালা দেবে। বাবা পছন্দ করেন।

নিশ্চয় পাঠাবো।

গড়াম করে ফোনটা ব্র্যাডেলে ফেলে দিয়ে কুসুমসিন্ধু চেঁচিয়ে বলল, এবার আমরা চলি। তাই না?

তিনজন মোসাহেব একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ স্যার!

সঙ্গে সঙ্গে কুসুমসিন্ধু দাবড়ে উঠল। কতদিন বলেছি না—দাবা খেলতে বসে স্যার স্যার করবি না।

দাদু অ্যাম্বুলেন্সে রওনা হয়ে যেতেই অলকসিন্ধু তার নীল রংয়ের নাক নিচু মারুতিতে গিয়ে বসলো। গাড়িটা এপথ সেপথ শুঁকতে শুঁকতে নীলমণি মিত্র লেনে একটা মুদিখানা পার হয়ে দাঁড়াল। অলকসিন্ধু বেড়াল পায়ে টুপটাপ করে ওপরে উঠে এল। বাড়িটার সদর সব সময় খোলা থাকে। কারণ, এজমালি বাড়ি।

বাড়ির যে পোরসানে অলক ঢুকবে তার সদর দরজাও খোলা। অলক ঢুকে গেল। ভাঙ্গা চেয়ার। খাবারের টেবিলে এঁটো ঘাঁটছে বেড়াল। পরপর কয়েকখানা ঘরের দরজাই খোলা। সামনের ঘরখানায় কোন ফার্নিচার নেই। একটা ছেঁড়া মাদুরে সেখানে একটি মেয়ে ঘুমিয়ে। তার হাতের পাশে একটি সেতার। মেয়েটির ডান হাতের আঙ্গুলে মেজরাব পরানো।

এই টুকু—ওঠো। ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

ঘুম ভেঙ্গে তড়াক করে উঠে বসল মেয়েটি। আমি যাব না।

কী বোকামি করছো। এই সন্ধেবেলা কেউ ঘুমোয়।

না আমি যাবো না।

তুমিই তো আসতে বললে। আজ তোমায় বিলায়েতের কাছে নিয়ে যাবো। পছন্দ হলে তিনি তোমায় তাঁর ছাত্রী করে নেবেন। ক'জনের ভাগ্যে এটা জোটে টুকু।

সবই আপনার পরিচয়ে হচ্ছে। বিলায়েত তো আমার বাজনা শোনেনি।

এবার শোনাবে। বোকা মেয়ে। যাও মুখ ধুয়ে চুল বেঁধে এস তাড়াতাড়ি।

আমি যাবো না আমার ডিভোর্স এখনো হয়নি। সেপারেশন চলছে। সবে। শেষে সেতার শেখাতে নিয়ে গিয়ে আপনি আমার প্রেমে পড়ে যাবেন। তখন আরেকটা গোলমাল বাধবে। আমার সাধের সেতার শেখা তখন শিকেয় উঠবে। আপনি যান।

না না। আমি প্রেমে পড়ছি না। আমি ম্যারেড তুমি জানো টুকু। আমার একটি সাত বছরের ছেলে আছে।

ম্যারেডরাই বেশি করে আমার প্রেমে পড়ে অলকবাবু। আমি জানি। এতদিন তাই দেখে আসছি। আমি গোড়া থেকেই সাবধান হতে চাই।

পাশের ঘর থেকে গলা ভেসে এল। কার সঙ্গে কথা বলছিস টুকু?

অলকবাবু এসেছেন।

ওমা! বলতে হয়—বলতে বলতে মাঝবয়সী এক মহিলা উঠে এলেন। দেখলেই বোঝা যায় ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। এঘরে এসে বললেল, কখন এয়েছেন? টের পাইনি। বোসো। ও টুকু—যা তো মা চা করে আন। গরম সিঙ্গাড়া আনবো? ভালো ভাজে এখানে—

সিঙ্গাড়া খাই না আমি। দেখুন তো—বিলায়েতের সঙ্গে কথা বলে সময় ঠিক করে এসেছি—এখন বলছে যাবো না।

আমার মেয়ে একটু খেয়ালী আছে বাবা। ক্ষমা করে নিও। ও ঠিক যাবে। এই মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছি। একখানি বাড়ির অংশ কামড়ে পড়ে আছি। কোথাও তো যাবার জায়গা নেই। বিয়ে দিলাম—তা ওর সেতারের পিড়িং পিড়িং শ্বশুর বাড়ির সহ্য হ'ল না। ফিরে এল। জামাইয়ের যত বদবুদ্ধি। ভাগ্যিস সময়মত মেয়েটারে নিয়ে এসেছি।

আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আছি। ওর বাজনা আমি শুনেছি।

কোথায় শুনলে বাবা?

ওর মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আমার দাদুর বাড়ি বাজাতে গিয়েছিল গত বছর—সিন্ধু গার্ডেনে।

ও। সেখানে তো আমি ছিলাম। ভিড়ের ভেতর দেখতে পাওনি। কত বড় বাড়ি তোমাদের—

আমরা ওখানে থাকি না। আমি থাকি লেক গার্ডেনে।

মা বাবা ?

মা থাকেন ক্যামাক স্ট্রিটে। বাবা দাদুর কাছে থাকেন। দিনের বেলায় মাঝে মাঝে ক্যামাক স্ট্রিটে যান।

কত বাড়ি তোমদের। এই সেতার বাজনা নিয়েই ওর সঙ্গে শ্বাশুড়ির লাগলো। জামাইয়ের মশল্লাপাতির দোকান। একদিন বাড়িতে কজন ব্যবসাদার নিয়ে এসে টুকুকে বাজাতে বলল। বোতল টোলত দেখে টুকুর তো চক্ষুস্থির। বলল, ওখানে আমি বাজাবো না। অমনি মারধোর। সেতার ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল।

সময়মত নিয়ে এসে খুব ভাল করেছেন। নয়তো একটা প্রতিভার মৃত্যু হোত।

কি বললে ?

প্রতিভা। ট্যালেণ্ট।

অ। আমি বলি কি বাবা—বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে। দেখতে শুনতে খারাপ নয় আমার মেয়ে—

খারাপ কে বলেছে।

ওর বাবার কাছে সেতার শিখেছিল। তা উনি তো অকালে চলে গেলেন। বয়সটাও এখন খারাপ টুকুর। তারপর সেতার বাজায়।- তোমরা বলছো—দেখতে খারাপ নয়—

আলবৎ।

তাই বলছিলাম—এই মেয়ের ভেসে যেতে কতক্ষণ যাবে।

তা কেন ? সেতার শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

কোথায় দাঁড়াবে ? মাটি কোথায় ? তাই বলছিলাম—তোমার পায়ে যদি ওকে একটু জায়গা দিতে—

তড়াক করে পিছিয়ে গেল অলকাসিন্ধু। আমি বিবাহিত। আমার একটি ছেলে আছে।

জানি। আমি সব শুনেছি টুকুর মুখে। আর শুনতে হবে

কি। তোমাদের এতবড় নাম করা পরিবারের কথা সবাই জানে। আমার বাবাই তো কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি খেয়ে গেছেন সারা-জীবন। আমি নিজে খুঁটি থাকতে দেখে এসেছি?

লোকে কি বলবে? আইন?

আইনে না গেলেই হ'ল। আর লোকের কথা। একটাই তো জীবন। তোমাদের পয়সা আছে। বৃহৎ কাষ্ঠে অর্শায় না বাবা। টাকা সব মুছে দেবে। টুকুকে না হয় এখানেই রাখলে। খরচ-খরচা দিলে। আমি দেখাশুনা করবো। চোখের ওপর থাকবে মেয়েটা। তুমিও আসবে যাবে। জামাই যেমন যায় আসে।

কি বলছেন?

ঠিকই বলছি। হ্যাঁ বাবা—তোমার কাছে কিছু টাকা হবে? টুকু সেতার শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ালে তোমার পাই পয়সা শোধ করে দেব। দাও। তাড়াতাড়ি দাও। এরপর টুকু এসে গেলে অনর্থ হবে।

অলকসিন্ধু পকেট থেকে না গোনা এক গোছা এক'শ টাকার নোট টুকুর মায়ের হাতে তুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা আঁচলে বেঁধে ফেললেন। তখনই টুকু চায়ের কাপ হাতে ঢুকলো। দেখুন তো চিনি ঠিক হ'ল কিনা। আপনার তো আবার লাইট লিকার চাই।

এক একটা এমন লাইন হৃষীকেশের চোখে এমন পারফেকট। এবার তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও তো।

সন্ধে নাগাদ খবরটা অফিসে চলে আসে। বড়সাহেব অসুস্থ। বেলভিউয়ে। হৃষীকেশ টেলিফোন করল দূরদর্শনে। আকাশ-বাণীতে। খবর এলেই জানাবো। যদি কিছু এখুনি হয়ে যায় তো আমরা গিয়ে খবর দিয়ে আসবো। বেশি রাতের বুলেটিনে ধরিয়ে দিতে হবে। এক লাইন হলেও ধরিয়ে দেবেন কাইণ্ডলি।

ছ'-ছটা প্যাকেটে ছবি সমেত অবিচুরারি রেডি করা আছে।

তিনটে বাংলা—আর তিনটে ইংরেজি কাগজের জন্যে। জন্ম ১৮৯০। পিতা কৃপাসিন্ধু রায়। আট ভাইয়ের ভেতর সর্বকনিষ্ঠ। কৃপাসিন্ধু তালমিছরির বড় হয়ে ওঠার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম। আজ যা-কিনা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে একটি হাইজহোল্ড নাম। যেখানেই খোকাখুকি—বুড়ো-বুড়ি—সেখানেই কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি।

নিজের লেখা অবিচুয়ারির ভেতর থেকে এক একটা এমন লাইন হৃষীকেশের চোখে উঠে আসছিল। এখনো নিশ্চয় মারা যাননি নয়নসিন্ধু। খুবই কাঁচা বয়সে সেই প্রায় আশি বছর বয়সে সবে যুবা এই নয়নসিন্ধুই কৃপাসিন্ধু তালমিছরির ভার নিয়েছিলেন। তার মাত্র তিন বছর আগে কৃপাসিন্ধু এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তখন নয়নসিন্ধুর সম্বল গোটা কয়েক ঢাউস লোহার কড়াই। তাও আবার তাদের জোড় খুলে এসেছে। এখন সেই কড়াইগুলোর ভেতর একটা কড়াই কাঁচের শোকেসের ভেতর ফুলটুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা আছে। রোজ সকালে কৃপাসিন্ধু তালমিছরির কর্মচারী একজন কাঁচের দরজা খুলে সেই কড়াইয়ে ধূপধুনো দেয়। এটাই তার ডিউটি। সে জন্যে তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, ইনক্রিমেণ্ড—সবই আছে।

হৃষীকেশ ঠিক করলো, একবার নার্সিংহোম ঘুরে তবে বাড়ি যাবে।

বেলভিউ গিয়ে লিফটের মুখে দেখা হয়ে গেল রঘুনাথের সঙ্গে। কেমন আছেন? এবার ধাক্কা সামলে উঠবেন বড়সাহেব। এখন আর গিয়ে কি করবেন। কাল সকালে আসুন।

সকাল ঠিক পারলো না হৃষীকেশ। লিফটে করে ওপরে উঠে নয়নসিন্ধুর সুটে পেঁছিতে পেঁছিতে প্রায় বারোটা হয়ে গেল হৃষীকেশের।

মিণ্টো পার্কের দিকে একখানা ঘর। তার মাঝখানে দুধসাদা

বিছানায় বসে সুপ খাচ্ছেন নয়নসিন্ধু। আরও দু'খানা ঘর লাগোয়া। পার্কের দিকে ঝুলবারান্দা একটা পুরো ফ্ল্যাট নিয়ে নয়নসিন্ধু সাত তলায়। এখন তার হাতে বিরাট একখানা চামচ। গলায় কফ। পাছে সুপ লেগে যায় বুকে।

কি হয়েছিল ?

মাথাটা ঘুরে। অত আলো। গরম—

এখন কেমন আছেন ?

যেমন দেখছো।

ভালোই দেখছি—বলে চারদিক তাকিয়ে দেখলো হৃষীকেশ। পাশের ঘরে ছোট টেবিলে বসে নয়নসিন্ধুর সেক্রেটারি খুব মন দিয়ে কিসের হিসেব লিখছে যেন।

সারাটা ঘর ঝকঝক করছে। ফুলদানীতে রজনীগন্ধার তোড়ার গলায় বেলি ফুলের মোটা একটা মালা। দেওয়ালের আয়নায় নয়নসিন্ধুর মাথা, মুখ। কালো চুল, কালো ভ্রূ, কালো গোঁফ।

ফস করে হৃষীকেশ গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, আবাব বং করেছেন।

পরিহাস রসিক নয়নসিন্ধু বললেন, ডাক্তারের অর্ডার। কি করবো বল।

কেন ? অর্ডার কেন ?

রং না দিলে আয়নায় দেখবো মাথাটা সাদা। দেখে মন খারাপ হবে। তাই রং করতে হয়।

অ। বলে নয়নসিন্ধুর হাত থেকে সুপের খালি প্লেটটা নিতে গেল হৃষীকেশ। পাশের ঘর থেকে রঘুনাথের জলদ গলা ভেসে এল। উঁহু। আপনি রাখতে যাবেন না হৃষীকেশবাবু। বড়সাহেব নিজে রাখবেন। তাহলে ওঁর হাতের ব্যাথা সারবে। হাতও খুলবে।

নিজের হাত পিছিয়ে নিল হৃষীকেশ। কিন্তু রঘুনাথও তো

কৃপাসিন্ধু তালামিছরির একজন কর্মচারী। সে এমন চড়া গলায় অর্ডার করে বড়সাহেবকে? হোক না হোলটাইম সেক্রেটারি। বড়সাহেবের ভাল চেয়েই না হয় এই চড়া গলা। তবু? তবু একটা তবু থেকে যায় কোথায়। হাজার হোক মাইনে করা কর্মচারী তো বটে।

পারবো না রঘু। হাত কাঁপছে। শেষে চাদর নষ্ট হবে।

উঁহু। খুব পারবেন। রাখুন বলছি। ডাক্তারের কথা তো শুনবেন।

হৃষীকেশ দেখলো, রঘুর গলা শুনে পাশের ঘর থেকে নার্স ছুটে এসেও দোরে দাঁড়িয়ে আছে।

নয়নসিন্ধু অনেক কষ্টে হাত কাঁপতে কাঁপতে প্লেটটা ঠং করে রাখলেন টিপয়ে। এবার নার্স এসে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধু হা হা করে উঠলেন। করো কি? করো কি?

বাধা দিচ্ছেন কেন? মুছে দিক। আপনার তো এখন স্পঞ্জ করানো বারণ।

এই যে চুলে রং দিয়ে দিলে। সব উঠে যাবে যে রঘু।

যাবে না। ওটা পাকা রং।

তাই বল।

আপনি এত কথা বলবেন না আজ। কাল সন্ধেবেলাতেও আপনাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছিল—মনে রাখবেন।

রঘুর গলায় ধমকানি যতই শোনে হৃষীকেশ—ততই চমকায়। এ-কি কোন কর্মচারীর গলা? না মালিকের? কিন্তু এখানে তো মালিক বড়সাহেব। আর সেই নয়নসিন্ধু? হৃষীকেশ অবাক হয়ে দেখলো, ঘরুর চোখে নিজের ঘোলাটে দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষটা রীতিমত কুঁকড়ে যাচ্ছে।

এ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। এরকম কিছু শোনা ছিল হৃষী-

কেশের। কিন্তু এতটা যে তা সে ভারতেও পারেনি। রঘুর শরীর স্বাহ্য ঝকঝক করছে। বয়স এই পঁয়তাল্লিশের ভেতর। পায়ে মোকাসিন। মালকোছা দিয়ে ধুতি, গায়ে হাত গোটানো ফুলশার্ট—চোখে ঘসা কাচের চশমা। লম্বা চওড়া চেহারা। একমাথা কালো চুল। বছর দশেক হল—নয়নসিন্ধু বিপত্নীক হওয়া ইস্তক রঘুনাথ তাঁর সর্বক্ষণের সেক্রেটারী। নয়নসিন্ধুর ওপর রঘুর যে কতটা দাপট তা জানা ছিল না হৃষীকেশের। কয়েক হাজার কর্মচারী নিয়ে কৃপাসিন্ধু তালমিছরির চেয়ারম্যান নয়নসিন্ধু নিতান্ত নিরুপায় মুখে রঘুর দিকে তাকিয়ে।

রঘু এবার হৃষীকেশের দিকে তাকাল। আপনাকে বড়সাহেব ভালবাসেন। আপনি থাকলেই বক বক করবেন। আপনি উঠুন।

॥ চার ॥

কলকাতার বিখ্যাত মেস বাড়ির তে-তলায় দক্ষিণমুখে ভালো দু'খানা ঘর নিয়ে বিখ্যাত গায়ক শচীকান্তর চল্লিশ বছরের ওপর ঘর সংসার। বিশ-বাইশ বছর বয়সে একটা হারমোনিয়ম হাতে এখানে এসে বোর্ডার হয়েছিলেন। তিনি একটু একটু করে নাম ছাড়তে থাকলে শচীকান্ত লাগোয়া ওই দু'খানা ঘর নিয়ে একদিন সংসার পাতেন। খাওয়াটা মেস থেকেই আছে। ঘরের সামনে একটু খোলা ছাদই তাঁর সংসারের উঠোন। এখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছে। পরপর দুই ছেলে হয়েছে। তারা পড়াশুনো করে বড় হয়ে চাকরি পেয়েছে—বিয়ে করেছে—দূরে চলেও গেছে। তাদের নিজেদের পছন্দমত বউ এক একজনের। বড় ছেলে তার কাজের জায়গা রাঁচিতে মাকে নিয়ে গেছে এই দিন তিনেক হল।

কাল তিন জায়গায় গাইতে হয়েছে শচীকান্তকে। বজবজ,

নিশ্চিন্তপুর আর বাগরাহাট। শেষ জায়গায় গান শেষ করতে রাত ফরসা। ভোর ভোর মেসে ফিরে টানা ঘুমিয়ে এই বেলা দুটো নাগাদ সেই ছোট ছাদে বসে থুপ থুপ করে নিজের গেঞ্জি রুমাল কাচছিল। শীতের দুপুরে। নিচে একতলায় ট্রাম থামার শব্দ। নিচে তাকালে গাদা গুচ্ছের পুরনো বাড়ির ছাদ—চিলেকোঠা, কার্নিশ। এরই ভেতর ঠিক কোন জায়গা দিয়ে—বুঝতে পারছিলেন না শচীকান্ত তাঁর সাত পুরনো এক রেকর্ডের গান ভেসে আসছে। অন্তত তিরিশ বছর আগের গলা। চেহারাটা তখন সুন্দর ছিল শচীকান্তর। গলাও ছিল তরতাজা। সেই সুবাদেই সন্ধ্যারাণী ভারতী দেবীর অপোজিটে তিন চারখানা বাংলা ছবিতে তাকে হিরো হতে হয়েছিল। সেই সময়কার গান। কে বাজাচ্ছে রেকর্ড। বিবিধ ভারতীতে নয়তো? ট্রানজিস্টর বাজিয়ে যে শুনবে তারও উপায় নেই। ব্যাটারি নেই।

গেঞ্জি কাচা থামিয়ে চুপচাপ নিজেরই ভেসে আসা গান মন দিয়ে শুনতে লাগলেন শচীকান্ত।

তুমি চাঁদ হয়ে থেকো আকাশে
আমি রব শিউলি শিশিরে।

এ রকম আরও কয়েকটা লাইন। নিচে বাসের ইলেকট্রিক হর্ন সব ছিঁড়েখুঁড়ে দিল। নিজের গাওয়া গানের কলি নিজেই মনে করতে পারলেন না শচীকান্ত। পায়ে স্যাণ্ডেল। সিল্কের লুঙ্গিতে শীত করছে। এই গানটা গাওয়ার সময় ছবিতে যে ড্রেসে ছিলেন তিনি—ধুতি পাঞ্জাবি—সেই ড্রেসেই তাঁকে ছবির পোস্টারে আঁকা হয়েছিল। কি পপুলারিটি তখন তাঁর। নীতীশ। শচীকান্ত, ছবি বিশ্বাস, প্রভা, নীতীশ। এভাবেই তখন নাম হোত পর পর।

কড়া নাড়ছে কে? সময়ে-অসময়ে সংসারের জন্যে লোক আসে। দর বাড়ানোর জন্যে শচীকান্ত গোড়ায় জানতে চান, হলঘর? না প্যাণ্ডেল?

যদি প্যাণ্ডেল হয় তো বলেন, এই বয়সে তো যেতে পারছি না ভাই। খোলা প্যাণ্ডেলে গান গেয়ে গলা নষ্ট করতে পারবো না।

একথা বলার পর পার্টি রেট বাড়িয়ে দেয়। কেন না, কষ্ট করে শচীকান্ত প্যাণ্ডেলে গাইতে রাজি হয়েছেন।

আবার যে পার্টি বলে হলভাড়া করেছি। আপনার ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই—তাদের শচীকান্ত বলেন, মাপ করো ভাই—হল-ঘরে ভিড়ের চাপে গাইতে বসে গলায় ঘাম বসাতে পারবে না। অন্য কাউকে দ্যাখো। অনেককে পাবে।

তখন পার্টি রেট বাড়িয়ে দেয়। কেন না, শচীকান্ত হলঘরে গাইতে রাজি হয়েছেন।

দরজা খুলে শচীকান্ত অবাক। একজন অত্যন্ত সুবেশ—মাঝ বয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে। দামী পারফিউমের গন্ধ। গায়ে ধবধবে ফরসা দামী শাড়ি। হাতে ভর্তি ঝকঝক করছে চুড়ির গোছা।

কোত্থেকে আসছেন ?

মহিলা কোন জবাব না দিয়ে চোখ তুলে শচীকান্তকে পা থেকে মাথা অব্দি জরিপ করলেন। নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিলেন শচীকান্ত। অন্য সময় খালি গায়েই দরজা খুলে দেন। আজই দরজা খোলার আগে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে নিয়েছেন। নয়তো মহিলার সামনাসামনি আতান্তরে পড়তেন। বিশেষ এক ধরনের গান গাওয়ার জন্যে শচীকান্তকে বাইরের জগতের সামনে সব সময় একটা রোমাণ্টিক ইমেজ বজায় রাখতে হয়। নয়তো বাজার নষ্ট হয়ে যায়। দরকার কি ষাট-বাষট্টি বছরের ভাঙ্গাচোরা শরীরটা সবার সামনে তুলে ধরার ?

আমি তো চিনতে পারছি না আপনাকে।

মহিলা খুব আস্তে বললেন, আমি মাধবী।

মাধবী ?

শেয়ালদা রেল কোয়ার্টারের মাধবী। চিনলে না ?

ভেতরে এস।

মহিলা বেশ কষ্ট করেই ভেতরে এলেন। বোঝাই যায়—সিঁড়ি ভেঙ্গে এমন ঘরে ঢোকার অভ্যাস নেই মহিলার। নিজেই চৌকিতে বসে বললেন, তোমার স্ত্রী ?

কলকাতায় নেই। বড় ছেলের ওখানে গেছে—বলতে বলতে শচীকান্ত জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন, ফুটপাত ঘেঁষে বিরাট একটা বিলিতি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

তোমার ছেলেদের বিয়ের কথা আমি প্রসাদ পড়ে জেনেছি। তোমার একটা ইন্টারভিউ থেকে।

ওসব এখনো পড়ো নাকি ?

তোমার কথা যেখানে যা বোরোয় তা আমি খুঁজে খুঁজে এই চল্লিশ বছর ধরে পড়ে আসছি।

তোমার বিয়েও তো এই চল্লিশ বছর হল। তাই না ?

হ্যাঁ শচী। আবার বিয়ের পরের বছর তুমি বিয়ে করলে।

দেখতে দেখতে অনেক বছর হ'ল মীরা। এখন তো গায়ক হিসাবে আমি মুছেই গেছি।

কে বলল ? আমাদের বয়সীরা তোমার কত ফ্যান ?

ফ্যান! সে তো তুমি আমার এক নম্বর ফ্যান ছিলে রেল কোয়ার্টারে। সবে একটা দুটো ফাংসনে গাইছি। তখন রেকর্ড হয়নি একখানাও। তখন থেকে—

হ্যাঁ। তখন থেকেই। আজও। আমার স্বামীও তোমার গান ভালবাসেন।

গান শোনার সময় পান তিনি ? কৃপাসিন্ধুর তালমিছরির মত অতবড় এমপায়ার তাঁকে দেখতে হয়—

ও একা দেখে নাকি! আমার শ্বশুর রয়েছেন। আমার ছেলে বসছে কারখানায়।

তোমার ছেলের বিয়ের খবর কাগজে দেখেছিলাম। গভর্ণর এসেছিলেন।

অনেকেই আসেন আমাদের বাড়ি। শ্বশুরমশাই লোকজন খুব ভালবাসেন। বলতো আমাদের সিন্ধু গার্ডেনে তোমার গানের জলসা করি একদিন। আমি আমার স্বামী, শ্বশুর, ছেলে, নাতি —সবাই সামনে বসে তোমার গান শুনবো।

না মীরা।

কেন ?

তোমাদের বাড়িতে আমি গাইবো না।

তোমার যা রেট তাই আমরা দেব।

টাকা নিয়ে তো আরও গাইবো না।

এটা তোমার প্রফেশন শচী।

ওসব থাক। এসো আমরা অন্য কথা বলি। কিছু খাবে। না। বরং তোমার একটা গান শুনি তোমার সামনে বসে।

সারা রাত গেয়ে গলার ঠিক নেই।

তাহলে তোমার একটা রেকর্ড বাজাও।

আমার রেকর্ড আমি বাড়িতে রাখি না।

একখানাও না ?

না মীরা।

কাছের কোন বাড়ি থেকে সেই রেকর্ডখানা কে আবার বাজাচ্ছে। মীরার চোখ কেঁপে উঠলো। সে কান পেতে গানটা ধরতে চেষ্টা করতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

কৃপাসিন্ধু তালমিছরির নতুন বাড়ি বলে যে জায়গায় প্ল্যাণ্ট, অফিস, ডেসপ্যাচ, ডাকঘর—সে বাড়িরও বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে

গেছে। তার ঠিক উল্টোদিকেই আগেকার পুরনো বাড়ি। সেখানে এখন বেশিটাই গোডাউন, গ্যারেজ। জানলা দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিলেন নয়নসিন্ধু। যেখানটায় ডিস্টিলারের একটা বড় খোল পড়ে রয়েছে—ওখানটায় আজ থেকে নব্বই বছর আগে তাকে আর দাদাদের নিয়ে মাষ্টারমশাই পড়াতে বসাতেন। তখন সকালে জল-খাবার ছিল মুড়ি আর গুড়। খাবার সময় চিবুকে সাদা মুড়ি আটতে থাকতো। আর সেই বয়েসেই মাষ্টারমশাইয়ের হাতে মার খেতে খেতে তাকে শুনতে হয়েছিল—ছেলের আর কি হবে! বিদ্যাসাগর মশাই-ই চলে গেলেন। সেই সময় ওই পুরনো বাড়িতে বাবা-কাকাদের এজমালি সংসার, তালগুড় জাল দিয়ে কষাবার উনুন কড়াই—সবই তখনও বাড়িতে। বেলা দেড়টায় সারা অফিস গম গম করছে। বেলা দেড়টায় সারা অফিস গম গম করছে। পরে বড় হয়ে নয়নসিন্ধু হিসেব কষে দেখেছেন—তার জন্মের পরের বছরই বিদ্যাসাগর গত হন। বাবা কৃপাসিন্ধু নাকি বিদ্যাসাগরের কড়া ক্রিটিক ছিলেন। তাঁর সীতার বনবাসকে বাবা বলতেন—কান্নার জোলাপ। আর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যে গর্বিত, বঙ্কিমের অনুরাগী। ফি বছর একখানা করে নতুন বিষবৃক্ষ কিনতেন। বাবার আলমারিতে নয়নসিন্ধু এ রকম সতেরখানা বিষবৃক্ষ পান। তিনি নাকি বিষবৃক্ষ রিডিং পড়ে শোনাতেন সবাইকে। বঙ্কিমচন্দ্র যতদিন বেঁচে ছিলেন কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি খেয়ে গেছেন। ক্লাশড্রেন্ডকে কয়েক শিশি করে পাঠাতেন কৃপাসিন্ধু। সে শতাব্দীও নেই—সেই মানুষজনও নেই। তখনকার গাড়ি-ঘোড়া, লোক-লস্কর, রাস্তা-ঘাট নয়নসিন্ধুও বালক বয়সে দেখেছেন। তার কিছুই আর নেই। সব মুছে গেছে। নতুন শতাব্দীও ফুরিয়ে এল। অথচ নতুন যুবক হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সময়—পরিষ্কার মনে পড়ে—নিজেদের মনে হত টাটকা বিংশ শতাব্দীর টাটকা মানুষ।

শেষে স্যার গুরুদাস গেলেন। গেলেন দেশবন্ধু, স্যার আশু-

তোষ, সুরেন বাড়ুজ্যে—রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। তাও তো পঞ্চাশ বছর হতে চলল।

নিখিলের আগোচরে

যে-গান অবিরত ঝরে

কার গান মনে করতে পারলেন না নয়নসিন্ধু। গানখানি তাঁর মনের ভেতর মাথার ভেতর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। শেষ এই বসার ঘর ছাড়িয়ে এই নতুন বাড়ির করিডরে ছাড়িয়ে পড়লো। যেন কেউ জোয়ারী দিয়ে গাইছে গানখানা। এ বাড়িও পুরনো হয়ে যাবে—এ দেহও জীর্ণ হয়ে যাবে—তাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গান—মৃত্যু অবিরাম বয়ে চলেছে। সেই কথাই সুরু হয়ে কিংবা মৃত্যু সুরে সুরে বেজে চলেছে?

নিজের অজান্তে সেক্রেটারিয়েত টেবিলে সেই সুর দিয়ে বাজিয়ে উঠলেন নয়নসিন্ধু। পাখোয়াজ বাজানো পাক্কা আঙ্গুল। তিন তালে কাঠি পড়ার মত নয়নসিন্ধুর আঙ্গুলগুলো বেজে উঠলো।

অ্যান্টিরুম থেকে রঘুনাথ ছুটে এল। করছেন কি?

কি হ'ল?

আবার মনে মনে সুর ভাঁজছেন। মনে মনেও কোন রকম পরিশ্রম করা আপনার বারণ।

অ। আচ্ছা শুধাংশুকে ডাকাও কালেকশনের কি হ'ল?

সুধাংশু এসে দাঁড়াতেই খুব গোপনে মনে মনে একটা দশ-কোশী তাল ঠুকে নয়নসিন্ধু বললেন, ইউ পি, রাজস্থান টেরি-টোরিতে এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা ডিস্ট্রিবিউটরদের ঘরে পড়ে আছে বাবা—

আপনি ভাববেন না। আমি ব্রাঞ্চ অফিসগুলোয় মেমো ধরিয়ে দিয়েছি—

নিখিলের অগোচরে।

যে গান অবিরত ঝরে—এ—এ

গানটা একচক্কর খোলাখুলিই গেয়ে উঠে একটা তেহাই দিয়ে আচমকা থামলেন নয়নসিন্ধু। থেমেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন, সাউদার্ন টেরিটোরিতে সাতাত্তর লক্ষ টাকার কালেকশন পড়ে আছে। তার কি হবে?

হকচকিয়ে গেল সুধাংশু। এ কি মালিক বে বাবা! তালে তালে নির্ভুল গাইতে গাইতে টাকার কথা পাড়ে।

আমি নিজে যাবো শনিবার। আপনি রাতের ভেতর টেলেক্স পাবেন।

তাই যাও। তাই যাও। কালেকশনের টাকা জমতে দিতে নেই কখনো।

সুধাংশু যেমন এসেছিল—তেমনি চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ বের করে বলল, সই করে দিন।

কিসের কাগজ? বলে পাশে দাঁড়ানো রঘুর দিকে তাকালেন। বলতে বলতে আতস কাচখানা দিয়ে কাগজের লেখাগুলো বড় করে দেখতে দেখতে বললেন, ওরে বাবা। এ যে দেখছি অনেক কথা লেখা। রেখে যাও। পড়ে দেখবো'খন কাল নিয়ে যেও—

সুধাংশু একটু অনিচ্ছুক ভঙ্গীতেই কাগজখানা তুলে বেরিয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধু হো হো করে হেসে রঘুর দিকে তাকালেন। রঘুপতিও সেই হাসিতে যোগ দিল। তারপর তারিফ দিয়ে বলল, সাবাস! যা বলেছি তাই করেছেন—

একদম পারফেক্ট। তাই না?

একদম পারফেক্ট। এত বড় কোম্পানির চেয়ারম্যান আপনি। সই করতে বললেই সাপ-ব্যাঙ কি আছে দেখবেন না? যা বলেছি —ঠিক তাই করেছেন কাগজখানা আমি পড়ে দেখবো। আমি

বললে তবে আপনি সই করবেন। কোন কাগজে হড়বড় করে সই দেবেন না কখনো।

তাতে যদি কাজ আটকে যায়?

যায় যাবে!

রঘুকে খুশি করতেই যেন নয়নসিন্ধুও দেখাদেখি বলে ওঠেন, যায় যাবে।

বড় জংশনে গাড়ি আটকে যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নসিন্ধু বললেন, আটকে যায় না।

থামুন। অত হাসবেন না। হাসার কি রয়েছে এত? বেশি হাসলে নার্ভের পরিশ্রম বারণ আপনার। দাঁড়ান—মুখটা তুলুন—চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

একেই চোখে কম দেখেন। একটা চোখে প্রায়ই জল কাটে। সেই হিমবাহ দেখতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগেছিল। এখন দু' চোখই জল ভরে আসায় তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। চোখ বুজে কোন অদৃশ্য আয়নায় সব দেখতে পাচ্ছিলেন নয়নসিন্ধু। বিলিতি তুলো রঘু তার গালের ওপর চেপে সাবধানে চোখের জল শুষে নিচ্ছে। ঘষলে পাছে মুখের কোঁকড়ানো কাগজ পারা চামড়া উঠে আসে হাতে! আজ তিনি রঘুর মনোযোগ পাবার জন্যে রঘুকেও সায় দিয়ে চলেন। তাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করেন। অথচ এই বিশাল কৃপাসিন্ধু তালমিছরি তাঁর নিজের হাতে গড়ে তোলা। এর এক এক খোপে বসে কাছে তাঁরই সব ময়না। ছেলে-ছেলের বউ, নাতি, নাত বউ, ওদের ছেলে। বেলভিউ থেকে ফেরার পর কেউ একবার তাঁর কাছে আসেনি। ঠাণ্ডা লাগলে কোন ডাক্তার গরম লাগালে কোন অজ্ঞান হলে কোন ডাক্তার, গরম লাগলে কোন ডাক্তার অজ্ঞান হলে কোন নার্সিংহোম আগাম ঠিক করা আছে। এটা একটা প্রতিষ্ঠান। এক প্রতিষ্ঠান আরেক প্রতিষ্ঠানকে দেখে। নজর রাখে। হেসে বা ভেবেও যাতে কোন পরিশ্রম না হয় তাও

এখানে লক্ষ রাখা হয়। লোক দিয়ে। কিন্তু তাঁর নিজের আমদানি পাখিগুলোর কেউ কাছে আসে না নয়নসিন্ধুর।

চোখ খুলুন। অমরবাবু বই নিয়ে এসেছেন আপনার জন্যে।

বই? অক্ষয়। কোথায়?

আপনার সামনে বসে।

রঘুর এ কথায় অক্ষয়ের চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো নয়নসিন্ধুর চোখে। ফিকে গোলাপী আভায় ছোপানো ধুতি-পাঞ্জাবি। সেই রঙের উড়ুনি গলায়। উড়ুনির নিচে কণ্ঠি বেরিয়ে। অক্ষয়ের গায়ের রঙটি বরফ। ঠোঁট শুকনো পানের রসে ছোপানো সব সময়। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে তাঁর জন্যে পুরনো হারানো হারানো সব বই জোগাড় করে আনে। বিয়ে-থা করেনি। ভাইপো-ভাইঝির সংসার। বই দিয়ে ক্যাশ থেকে যা বিল পায় তাতেই অক্ষয়ের চলে যায়। ওই বিলের টাকাতেই গত তিরিশ বছরে একখানা বাড়িও করেছে অক্ষয়।

কি বই অক্ষয়?

আজ্ঞে বিপিন শুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ—

পেয়েছো? নয়নসিন্ধু ভাবলেশহীন চোখ জ্বলে উঠতে চাইল। ও বইতে অক্ষয় বাবার কথাও আছে—

সে জায়গাগুলো দাগিয়ে এনেছি।

আঃ। দাগাতে গেলে কেন?

আপনি পাতা ওল্টালেই পেয়ে যাবেন।

তার চেয়ে আমি পড়তে পড়তে পেয়ে গেলে কত আনন্দের হোত ভেবেছো?

আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।

এ বই আমার ছিল অক্ষয়। কে যে নিয়ে গেল।

পাঁচ কপি এনেছি।

বাঃ! বাঃ! এই তো চাই। আর কি পেলে?

রোনাল্ডসের—

কথা শেষ হ'ল না অক্ষয়ের। চেয়ারে প্রায় উঠে বসেন নয়নসিন্ধু। রঘু প্রায় দাবড়ে ওঠে। কি হলো? আপনার উত্তেজনা বাড়ছে।

একটু তো উত্তেজিতই হবো রঘু। একই দিনে পুরাতন আর রোনল্ডসের ভল্যুমগুলো পেয়ে কার না উত্তেজনা হয়। বিলিতি কেচ্ছার গোডাউন হ'ল গিয়ে রোনাল্ডসে।

ওটা পাঁচ কপি পেয়ে গেলাম। দাম একটু বেশিই পড়লো।

তা তো পড়বেই।

এমন সময় হৃষীকেশ এসে ঘরে ঢুকলো। একই বই পাঁচ কপি করে টেবিলে দেখে জানতে চাইলো, পাঁচখানা করে? কি ব্যাপার?

হৃষীকেশকে ভাল লাগে নয়নসিন্ধু। হেসে বললেন, আমার বিষয়সম্পত্তি বলতে বই হৃষীকেশ। সারা জীবন কিনে আসছি।

তা বলে একই বই পাঁচখানা।

আনন্দের হাসি হাসলেন নয়নসিন্ধু। কারণ আছে। বুঝলে—এক কপি সিন্ধু গার্ডেনে থাকে। লখনউ, এলাহাবাদ, জামসেদপুরের বাড়িতে এক কপি করে রাখি

মোট চার কপি হোল। আরেক কপি?

চোরের জন্যে। চোরের জন্যে এক কপি রাখি।

এটা আপনার বাজে খরচ বললো।

তা বলতে পারো হৃষীকেশ। এটা আমার বাবুয়ানি বলতে পার। একটা বয়স ছিল—যখন অঢেল স্বাস্থ্য ছিল। বয়স কম ছিল। কাজের আনন্দ ছিল। রোজই নতুন কিছু আয় করছি। অভিজ্ঞতা, টাকা, সম্মান, ভালবাসা। তারপর একদিন বুড়ো হয়ে গেলাম। আর আনন্দ হয় না হৃষীকেশ। ক্ষয় দেখতে পাই সর্বত্র। কিছুই বাঁচানো যাবে না মৃত্যুর হাত থেকে। আগে রোজ সকালে আনন্দ হোত। এখন এক এক সময় চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে।

আপনি আর কথা বলবেন না তো। রঘু এগিয়ে এসে নয়নসিন্ধুর হাত থেকে বইগুলো নিয়ে তাকে তুলে রাখলো। আপনার নিশ্চয় প্রেসার বাড়ছে।

হৃষীকেশ জানতে চাইল, আপনার প্রেসার কত ?

আজকাল আর মাপি না। ডাক্তার মাপে—ডাক্তার জানে।

আপনি জানেন না ?

আগে জানতাম। ছেঁচল্লিশ বছর আগে শেষ মেপে ছিলাম। তার আগে তিনবার মাপাই। নাইনটিন থার্টি সেভেন, টোয়েণ্টি সিক্স আর নাইণ্টিনে।

সব ক'বারই নরমাল ছিল। নিচে আশি ওপরে তিরিশ থেকে একশো চল্লিশের ভেতর। খুব অপমান লাগতো।

কেন ?

এত লোকের কৃপাসিন্ধু তালমিছরি আমি চালাই—আর আমার বলবার মত কোন প্রেসার নেই!—টেনশন নেই!—বড় লজ্জার কথা! প্রেসার তো হৃষীকেশ একটা স্ট্যাটাশ। পেসার মনে পড়লেই মরমে মরে যেতাম।

আপনার এবারের জন্মদিনে সব ক'টা ডেইলি কাগজে ফুলপেজ সাপলিমেণ্ট বেরোবে। আপনার সম্বন্ধে লেখা বেরোবে। কাদের দিয়ে লেখাবো বলুন তো ?

এই তো মুশকিলে ফেললে। কে লিখবে! যারা জানতো সবাই তো মরে গেছে।

গড়িয়ার নুটু দও ? উনি তো আপনাকে জানতেন—

উঁহু। নুটুকে দিয়ে হবে না। ও জল বানান ছয় রকম লেখে। তার চেয়ে তুমিই লেখো। আর দ্যাখো বাপু—আমার অল্প বয়সের ছবি ছাপতে দিও। অল্প বয়সের কত মজা জানো ?

কি রকম ?

একবার তো ট্যাণ্টামাউণ্ট কথা শুনলাম। শুনে তো খুব

ভাল লাগল। তখনো আমার বিয়ে হয়নি। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগের কথা। ট্যাণ্টামাউণ্ট কথাটা নিয়ে মনে মনে লোফালুফি করি আর খুব আনন্দ হয়। কেন? না, আমার মনে ট্যাণ্টামাউণ্ট কথাটা আছে।

একদিন একদিন এক সাহেবকে লেখা চিঠি টাইপ করছি। দিলাম তার ভেতর ট্যাণ্টামাউণ্ট কথাটা বসিয়ে। সাহেব তো চিঠি পেয়েই ছুটে এল। এ টুমি কি লিখিয়াছো বাবু? প্লিজ কমপ্লেইন। আমার তো গলদঘর্ম দশা। সাহেব নাছোড়।

আর একটি কথাও নয়। আপনি খুব বেশি হাসছেন এবার আপনার রেস্ট দরকার। আপনি উঠুন হৃষীবাবু। নইলে বড় সাহেব কথা বলেই যাবেন—

হৃষীকেশ উঠলো। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হ'ল—এই তালমিছরি সাম্রাজ্যের সম্রাট যেমন কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করেও নিজেকে কখনো সাধারণের চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না—তেমনি আবার ট্যাণ্টামাউণ্টের মত একটা শব্দ স্টকে থাকলে নিজেকে ধনী জ্ঞান করেন। আলাদা আনন্দ হয় তাঁর।

॥ ছয় ॥

ফাল্গুন পড়তে না পড়তেই শীত এতদম নেই। সারা দিন পাগলা বাতাসে সিন্ধু গার্ডেনের গাছপালা এলোপাথারি দুলছে। বেনারসী ল্যাংড়া কলমের গাছটার গা ভরে বউল। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে খুঁত খুঁত করে উঠলেন। নয়নসিন্ধু। সব যে ঝরে যাবে রঘু—

পাশেই দাঁড়ানো রঘু। পাম্পসু উথলে পায়ের পাতায় মাংস। চোখে ভারি কাচের চশমা। সেই অনুপাতে লম্বা-চওড়াই চেহারায় কুর্তা-পাজামা। গম্ভীর চালে বলল, যত দোলে তত ঝরে না।

আপনি চুপটি করে বসুন তো। এখুনি আপনার ছেলে আসবেন।

আমার ছেলে আমার কাছে আসবে—তাতে কি হয়েছে? যা বললাম—তার জবাব এই হ'ল?

আঃ! বুঝছেন না কেন? আপনি বাগান করেছেন। কিন্তু আমি তো মাঠের ছেলে কেমন কি না?

হ্যাঁ। মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে—আমি ধরে এনে তোমায় সেক্রেটারি করেছি আমার।

আমি এই সিন্ধু গার্ডেনের গায় মাঠে মাঠে বাপ-খুঁড়োদের গরু চরাতাম। আমি মাঠের ধর্ম জানি। এ বাতাসে সব বউল ঝরে গেলে সারা দেশে একটা আমও হোত না। বুঝলেন—

তুমি এত বোঝাও কেন আমায় বলতো রঘু?

চটছেন কেন? আপনার জন্যে আজ আমার সব। আপনাকে ভুল করতে দিতে পারি আমি? বলুন?

বুঝলাম।

আপনার জন্য আজ আমার দু'খানা মিনিবাস, আন্দুল-মৌরী লাইনে একখানা প্যাসেঞ্জার বাস। কলকাতা শহরে একখানা বাড়ি—

ওসব কথা তুলছো কেন রঘু?

আমি গ্রেটফুল বড়সাহেব। আপনার কাছে আমার টিকিট বাঁধা সাহেব। দশ বছরে আমার জীবনই আপনি পাল্টে দিয়েছেন।

তা তো বুঝলুম। এত কথা আসছে কোত্থেকে?—

এখন তো তুমি বিষর-সম্পত্তিওয়ামলা মানুষ। বিয়ে করেছো। দেশে মেয়ে হয়েছে। বাপ-ভাইয়ের কুঁড়ে-ঘর থেকে পাকা বাড়িতে এনে তুলেছো।

তা এনেছি। রাতে বাড়ি ফিরে মিনিবাস-বাসের টিকিট বিক্রির হিসেব দেখতে হয়। দশ বছর আগে পাচন হাতে গরু চরাতাম।

এখন কেমন লাগে রঘু?

ঘুম হয়না বড়সাহেব। বিছানায় উঠে বসে থাকি। মিনিবাসে চুরি হচ্ছে জানি। কিন্তু কিছু করতে পারছি না করতে হলে মিনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়।

তোমার তো চলে যাচ্ছে?

তা যাচ্ছে বড়সাহেব।

তাহলেই হ'ল। বাকিটা চোখ বুজে থাকো। আমাকে দ্যাখো না আমি তো কিছুই দেখি না।

আপনার সঙ্গে আমার কথা পাশাপাশি বলবেন না।

ওই একই তো। সেই প্রপার্টি। অথচ আমি তো সারাদিন ঘুমের ভেতর ডুবে থাকি।

আমাদের ব্যাঙের আধুলি সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়।

ভুল করছো রঘু। সবার সম্পত্তিই ব্যাঙের আধুলি।

ওই আপনার ছেলে আসছেন। কুসুমবাবুকে ঘরের কথাটা একবার বলবেন কিন্তু।

বলার ফাঁক পেলে তো। এত তড়বড় করে ছেলেটা—

তবু বলবেন। নতুন বাড়িতে সবার নামে নামে ঘর উঠছে। আপনি বললে—কুসুমবাবু কি সেকথা ফেলবেন—

কুসুমসিন্ধু এদিকেই আসছিলেন। এ কি বাবা এখনও রেডি হয়নি? ও রঘু—তোরা করিস কি সারাদিন। সিংহাসনটা নামাতে বলিসনি? মাসের একটা দিন বাবার অভিষেক—তা নাকি কারও মনে থাকে। দুধ কোথায়?

ওই তো—বলে বড় হাঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে নিজেই আবার বলে উঠলো, বিশ কেজি আনালাম—

বেশ করছো। চন্দন? চন্দন কোথায়?

বাটিতে রাখা আছে।

গামলা? বড় গামলাটা? ওই তো। এসে গেছে। জানিস

রঘু—মা আমাকে ওই গামলায় চান করাতেন—এই আট-দশ মাস বয়সে।

অত বড় গামলায় ?

বাঃ! আমিও যে তখনই রীতিমতলম্বা—নয়তো এই ছ'ফুট চার ইঞ্চির খাঁচা হয়।

তারিফের ভঙ্গিতে নয়নসিন্ধুর একমাত্র ওয়ারিসানকে দেখছিল রঘু। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও রীতিমত পাঠান জোয়ান যেন কুসুমসিন্ধু। টকটক করছে গায়ের রং। রোজ সকালে নাকি টক দইয়ের সঙ্গে খানিকটা করে মুক্তাভস্ম খান কুসুমসিন্ধু। চওড়া কাঁধ। সিংহ কটি মাথার চুল পর্বতশৃঙ্গ। গলার রুদ্রাক্ষ বুক অব্দি। হাত দু'খানা তালমিছরি জাল দেবার বেলচা হাতা। সবুজ ঘাসের ওপর পা দ'খানা দেবে বসে গেছে। রঘুর মনে হ'ল—এ মানুষটা অমর। কোনদিন নয়নসিন্ধু হবে না। এর কাছ থেকে নতুন বাড়িতে নিজের বসার জন্য একখানা ঘর আদায় করা কঠিন। খুবই কঠিন।

বাবা। যেমন বসে আছো, থাকো। পা দু'খানা শুধু গামলার ভেতর এগিয়ে দাও। এবার দুধ ঢালবো।

আমার ঠাণ্ডা লাগবে যে—

চোপ। দুধ দিয়ে পুজো করছি তাতে খুশি নয়।

নয়নসিন্ধুর কোমরে ধুতি। খালি গা। ফ্যাকাশে ধরনের হাড়েমাসে শরীর। গলা থেকে হাঁটু অব্দি সেলোফেন পেপার দিয়ে মোড়া। মাথাতেও সেলোসেনের টুপি। এটা আগাগোড়া রঘুর ব্যবস্থা। কুসুমসিন্ধুর পক্ষে দুগ্ধস্নানে অভিষেকও হ'ল—আবার নয়নসিন্ধুর গায়ে ঠাণ্ডাও লাগে না।

একটা সোনা বাঁধানো ঘটিতে দুধ তুলে কুসুমসিন্ধু নয়নসিন্ধুর মাথায় ঢাললো।

আঃ। ঠাণ্ডা লাগবে যে—

কথা বলো না বাবা। এখন তোমায় পুজো করছি।

পুজোই করিস—আর যা-ই করিস—এ বয়সে ঠাণ্ডা লাগলে নিউমোনিয়া হবেই—

চোপ। পুজোর সময় ভগবানও কথা বলে না বাবা। একটু চুপ করে থাকতে পারো না। তোমাদের ধৈর্য নেই। দেখছো পুজো করছি।

ধৈর্যের কথায় হেসে ফেললেন নয়নসিন্ধু। মনে মনে বললেন, ধৈর্য না থাকলে কৃপাসিন্ধু তালমিছরির মত শেয়ার হোল্ডার কোম্পানিকে এই অবস্থায় ঠেলে তুলতে পারি? বাবা কি রেখে গিয়েছিলেন? একগাদা দেনা আর গণ্ডায় গণ্ডায় পোষ্য। বাড়ির খুকটিরও শেয়ার ছিল। কোম্পানিকে বড় করেছি। আর পাশা-পাশি এক একজনের শেয়ার কিনেছি জলের দরে। সব শেয়ার তোর জন্যে এক জায়গায় করেছি। ধৈর্য নেই আমার। তুই আমার চোখের মণি। তুই যখন এতটুকু তখন থেকে তোর নামে শেয়ার ট্রান্সফার করে চলেছি। তবে না কৃপাসিন্ধু তালমিছরি আজ বাজারে এতবড় গুডউইল। নইলে সবই তো বারো ভুতে লুটে খেয়ে কোম্পানি ফোঁপরা করে ফেলতো।

এবার পা এগিয়ে দাও। দিয়েছো—বলে খুব সাবধানে আরেক ঘটি দুধ ঢালতে লাগলেন কুসুমসিন্ধু। মাথার সেলোফেনের টোপর টপকে দুধ নয়নসিন্ধুর সেলোফেন ঢাকা বুক বেয়ে হাঁটু ছাড়ালো। সেখানেও সেলোফেন। তারপরই খালি পা। পা ধোয়ানো দুধ গিয়ে পড়ল গামলায়। সেখানে গামলার ওপর ওকটি রুপোর কাপ বসানো।

এইভাবে দুধ ঢালতে ঢালতে কাপ দুধে ভরে যেতে কুসুমসিন্ধু থামলেন। থেমে বললেন, নে রঘু—এবার বাবার গা মুছিয়ে জামা পরিয়ে দে—

রঘু গা মোছাচ্ছিল। কুসুমসিন্ধু রুপোর কাপ ভর্তি দুধটা

এক ঢোকে খেয়ে নিয়ে নয়নসিন্টুকে এগিয়ে দেওয়া পায়ে তিনবার মাথা ঠেকালো। তারপর বুক পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল নাও।

ওটা কি?

পুজো করে প্রণামী দিতে হয়। জানো না?

নয়নসিন্ধু বললেন, ভগবান কি হাত পেতে নেয় কখনো? এখানে রেখে দে—

কুসুমসিন্ধু একশো টাকার প্রণামীর নোটখানা রুপার কাপ দিয়ে চাপা দিলেন।

তখনই শার্টে মাথা গলাতে গলাতে নয়নসিন্ধু বললেন, নতুন বাড়ীতে আমার ঘরের লাগোয়া একখানা ছোট ঘর রাখবি।

সে দেখা যাবে—

না। দেখা যাবে না। রাখতে হবে। আমার লোকজন বসবে কোথায়?

তা তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বলেই ঘাসের ওপর দামী পাম্পসুর শব্দ তুলে কুসুমসিন্ধু বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

নয়নসিন্ধু খুব অস্ফুটে বললেন, দেখলি তো।

দেখবো কি? আপনার গড়ে তোলা কোম্পানি—আপনি যদি জোর দিয়ে কিছু না বলেন—

এর চেয়ে বেশি কি জোর দেব। কুসুমও তো কোম্পানির সর্বেসর্বা।

তাই বলে আপনার ওপরে তো নয়।

ওরে বোকা। কেউ ওপরে—কেউ নিচে নয়। ও না থাকলে তো আমার এসব গড়ে তোলাই মিথ্যে হয়ে যায়।

বালাই তা বলিনি বড়সাহেব, কিন্তু আপনার ইচ্ছেটাও তো ফেলে দেবার নয়।

তা তো বটেই।

নয়নসিন্ধুর সেক্রেটারি ঠিক বুঝতে পারলো না, বড়সাহেব কোন্ কথাটা সিরিয়াসলি ধরছেন।

॥ সাত ॥

ডাক্তার ব্লাড রিপোর্ট দেখে বলল, আপনার ব্লাড সুগার তো বেশ ভাল রকম হয়েছে। এত কম বয়সে—

আমার এই তিরিশ-একত্রিশ।

খুব চিন্তা করেন বুঝি?

খুব একটা নয় তবে বোঝেন তো—মিনিবাস দু'টো, বাসটা গ্যারেজে না ফিরলে রাতে শুতে পারি না। ভয় হয়—কোথাও আবার অ্যাকসিডেণ্ট করলো না তো।

রঘুর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলল, চিন্তার দিকটা কমাতেই হবে। আপনি তো ভাল চাকরিও করেন।

কৃপাসিন্ধু তালমিছরির চেয়ারম্যানের প্রাইভেট সেক্রেটারি আমি।

এছাড়া এত কম বয়সে কলকাতায় বাড়ি করেছেন।

তা করেছি।

তাহলে তো স্ট্রেস অ্যাণ্ড স্ট্রেইন থাকবেই। প্রপার্টির একটা চাপ সব সময়েই থাকে। আর আপনি তো সব এই সামান্য বয়সের ভেতর করেছেন।

এর চাপ তত নয়—তার চেয়ে মনের ওপর চাপ পড়ে বেশি—নিচে অপমান সহ্য করতে হলে।

যেমন?

একটা এগজামপেল দিচ্ছি ডাক্তারবাবু। আমাদের নতুন অফিস তৈরি হচ্ছে—বিরাট বাড়ি। হেজিপেজির জন্যে সেখানে চেম্বার হচ্ছে। কিন্তু আমি বাদ।

কেন ?

আমি যে বড়সাহেবের পেয়ারের লোক। বড়সাহেবের অনুগ্রহে আমার বাড়ি, মিনিবাস, বাস হয়েছে। মাইনে পাচ্ছি কোম্পানির সিনিয়র স্কেলে। এতে সবার চোখ টাটায়। বড়সাহেবের ছেলের কাছে আমার নামে কেউ লাগানি-ভাঙ্গানি করেছে নিশ্চয়। এসব ভাবলে খুব যন্ত্রণা হয় মনে।

উঁহু। এসব ভুলতে হবে রঘুবাবু। কার্বোহাইড্রেট আর খাবেন না।

সেটা কি ?

এই ভাত, রুটি—এইসব আর কি ?

গরীবের ছেলে। ভাত খেয়ে বেড়ে উঠেছি। তাছাড়া থাকবো কি করে ডাক্তারবাবু।

থাকতে হবে। এখন তো অবস্থা ফিরেছে। মাংস খাবেন। মাছ খাবেন।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোবার আগে রঘু বলল, জানেন ডাক্তারবাবু যাদের চোখ টাটায় তারা জানে না। বড়সাহেবের জন্যে আমাকে কতক্ষণ থাকতে হয়। রাতে ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি বাড়ি ফিরি।

কত বয়স হ'ল নয়নসিন্ধুবাবুর ?

কুলোকে বলে একশো সাত বছর, কিন্তু আসল বয়স সাতানব্বই। ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন তাও প্রায় বিশ বছর। দেখার কেউ নেই।

টাকাই দেখে ওঁকে।

এক রকম তাই বলতে পারেন। ছেলে খোঁজ নেন ফুল পাঠিয়ে। আর মাসে একবার পাদোদক খেতে আসেন বাবার—

এত ভক্তি।

খাঁটি ভক্তি। তাতে কোন ভেজাল নেই। পুত্রবধূ, নাতি,

নাতবৌ—সবাই ব্যস্ত। কেউ আসে না। বড়সাহেবের মন খারাপ হলে আমি। মন ভাল থাকলেও আমি।

মন খারাপ হলে কি করেন ?

ওঁকে এদিক-সেদিক—ওঁর পছন্দর জায়গায় ঘুরিয়ে আনি।

আনন্দ হলে ?

ওঁর যাদেরকে পছন্দ তাদের এক একজনকে ধরে আনি।

তা নয়নসিন্ধুবাবুর বয়সের বন্ধুরা কেউ কি এখনো আছেন ?

একজনও নেই। কিন্তু তাদের বংশধররা আছে। তাদের কাছে গিয়ে বড়সাহেব বন্ধুর কথা বলেন—বন্ধুর কথা শোনেন। গঙ্গার ফেভারিট ঘাটে গিয়ে বসেন। নয় তো প্রিয় বই পড়েন।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসেই রঘু ড্রাইভারকে বলল, দক্ষিণেশ্বর চল। বলেই খেয়াল হ'ল, কতকাল পায়ে হাঁটা হয় না তার।

সেখানে গিয়ে মন্দিরের চাতাল পেরিয়ে রঘু গিয়ে গঙ্গার ঘাটে বসলো। জল এসে সিঁড়িতে আছাড় খাচ্ছে। সে বেশ অল্প বয়সেই একজন সফল বিষয়ী মানুষ। ইদানীং তার এক চিন্তা হয়েছে। বড়সাহেব যতদিন—ততদিন এই চাকরি। বড়সাহেব আর কতদিন। হাত থেকে ছড়ি খসে পড়ে ঘন ঘন। এক চোখে অনবরত জল কাটে। কিছু শুনতে পান না। দেখতে পান আরও কম। প্রায়ই অজ্ঞান হচ্ছেন। বড়সাহেব চলে গেলে তার কি হবে ? তখন তো কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না। এখন যে করেই হোক বড়সাহেবকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

কোন কথা ছিল না—কোন চিন্তাও ছিল না—যদি বড়সাহেব যেতে যেতেই সে তাঁর জায়গায় কুসুমসিন্ধুর প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে পারতো। কিন্তু কুসুমসিন্ধুর ভেতর জবুথবু হয়ে পড়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং বয়স আন্দাজে কুসুমসিন্ধু

বেশি বেশি করে তাজা টাটকা। বুড়ো হয়ে পড়ার কোন চিহ্নই নেই। অথচ বড়সাহেবের সঙ্গে থেকে তার যা কিছু ট্রেনিং বুড়ো মানুষকে নিয়ে। বুড়ো মানুষের সখ। বুড়ো মানুষের প্রাণের কথাটি জানা। বুড়ো মানুষের মন খারাপ এইসব সে জানে। নতুন কোন বুড়ো না পেলে তার এই শিক্ষাই মিথ্যে। তখন কী করবে এই জ্ঞান নিয়ে? সিন্ধু গার্ডেনের লাগোয়া ধানক্ষেতে সে হোল ফ্যামিলির গাই-গরু চরাতো বেশি বয়স অব্দি। বিদ্যে কোন রকমে ক্লাস এইট। এখন তার বাচ্চারা পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে। অভিভাবকদের বার্ষিক সভায় সে রীতিমত বক্তৃতা দেয় সেখানে। তাকে ইংরেজিতে বলা হয় গার্জিয়ান।

তার এই সম্মান প্রতিপত্তি সব ধুলোয় মিশে যাবে—নতুন বাড়িতে অফিস উঠে যাবার পর তার কপালে যদি আলাদা একখানা চেম্বার না জোটে।

গঙ্গার ওপারেই বেলুড়। সেদিকে আলোর মালায় তাকিয়ে রঘু হাত জোড় করল। ঠাকুর! একটু মুখ চেয়ো। আমি রঘুপতি গুহ—বিবেকানন্দের মত আমিও কুলীন কায়েত। তুমি তো সবই জানো ঠাকুর।

এদিকে ঠিক এই সময় হৃষীকেশকে নিজের লাইব্রেরী দেখাচ্ছেন নয়নসিন্ধু। হৃষীকেশ নোটবই নিয়ে সিন্ধু গার্ডেনে এসেছিল। নয়নসিন্ধুর এবারের জন্মদিনে যে সুভেনির বা স্মরণিকা বেরোবে তার বিষয়বস্তুই স্বয়ং নয়নসিন্ধু। এমন কি কৃপাসিন্ধু তালমিছরির নতুন ক্যামপেনেও নয়নসিন্ধুর মুখের কথা দিয়েই বিজ্ঞাপন হবে। সে সব টুকে নিতেই হৃষীকেশের এতটা আশা।

কিন্তু কথায় কথায় কথাবার্তা যেই কৃপাসিন্ধুতে গিয়ে ঠেকলো —অমনি বিশাল উনিশ শতাব্দীর দরজা-জানলা ওদের দু'জনের সামনে খুলে গেল।

নয়নসিন্ধু নিজের লাইব্রেরি দেখাতে দেখাতে বলেছিলেন, তুমি

বোধহয় জানো—বিদ্যাসাগরমশায় বাবাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। বাবাকে মনে করতেন ক্যানটাং ক্যারাস।

কেন?

আসলে বিরোধটা ছিল অন্য জায়গায়। উনিশ শতকের দিকে ভাল করে তাকালে বুঝতে পারবে—সারা শতাব্দীকে উদ্যোগী বাঙ্গালী তিনভাবে নিয়েছিল। একদল বাঙ্গালী গেলেন ইংরেজের চাকরিতে। যেমন বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ, কিশোরী মিত্তির, বঙ্কিমচন্দ্র। আরেক দল বাঙ্গালী চলে গেলেন বড় ব্যবসায়—দ্বারকানাথ, রামদুলাল, দেবেন্দ্রনাথ এইসব আর কি। আরও একদল বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁরা না গেলেন বড় ব্যবসায়—না গেলেন বড় চাকরিতে। আমার বাবা কৃপাসিন্ধু ছিলেন এই দলে। এঁরা বড় ব্যবসায়ে না গিয়ে নিজের বিশ্বাসমত সংস্কার সমাজ বদলাবার জনমত গড়তে লাগলেন। তখন তো তালমিছরি খুব একটা ইণ্ডাস্ট্রি নয়। বাবা তো প্রথম পনের বছর ইণ্ডাস্ট্রি নয়। বাবা তো প্রথম পনের টাকা লোকসান দিয়েছেন। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের কথা নিজের মত করে বলার জন্যে ওঁরা যুদ্ধ করেছিলেন।

হৃষীকেশ নয়নসিন্ধুকে এভাবে কোনদিন কথা বলতে দেখেনি। সে যা দেখেছে তা হ'ল নয়নসিন্ধু সব কিছুই হাসিঠাট্টা কৌতুকের চোখে দেখে থাকেন। খুব গুরুতর ব্যাপারও নয়নসিন্ধু হাসির হররা দিয়ে হাল্কা করে নেন। আজকে তার সামনে এ এক অন্য নয়নসিন্ধু।

তুমি বোধহয় জানো না হৃষীকেশ, নাইনটিনথ সেঞ্চুরির শেষ দিকে কলকাতার মিউনিসিপ্যাল ভোটে সাধারণ মানুষের হাতে ভোটের অধিকার তুলে দিতে আমার বাবা একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। একজন তালমিছরি ব্যবসায়ীর এ কাজ করার কথা নয়। সে জন্যেই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বেধেছিল। বোধহয় এই বিদ্যাসাগরমশায় বাবাকে ক্যানটাং ক্যারাস মনে করতেন।

বিদ্যাসাগরমশায় কি ইংরেজের জো হুজুর ছিলেন? তা তো নয়।

নয় তো বটেই, কিন্তু বিদ্যাসাগরমশায় ছিলেন অনেকটা—

মনে মনে নয়নসিন্ধুকে তারিফ না করে পারল না হৃষীকেশ। এর চেয়ে ভাল করে আর বলা যায় না মানুষটির মস্তিষ্ক স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। সে আবার সেই পুরনো কথাটাই ফিরে বলল, এবার থেকে কৃপাসিন্ধু গবেষণা বৃত্তি দিতে থাকুন। তাতে দেশের লাভ। লাভ আপনাদের তালমিছরির।

এসব কথায় কান না দিয়েই নয়নসিন্ধু বললেন, এই দ্যাখো—প্রথম দিন থেকে পাঞ্চ স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন এখানে পাবে।

এসব কার কালেকশন?

বাবার। আমিও কিনেছি অনেক। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাঁকিপুর কালেকশন পুরোটাই কিনে এনে এখানে রেখেছি।

বই আর দেখলো না হৃষীকেশ। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের ছড়ানো ঢেউগুলো অজানা মানুষেরা এভাবে কিনে কিনে সংগ্রহ করে রাখে। বেশির ভাগই সেইসব মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পোকার খাবার হয়ে দাঁড়ায়। শেষ অব্দি সবই কালের অতলে।

॥ আট ॥

ডবল বেডের বিছানার একদিকে আধো খোলা বই পড়ে আছে। ফেব্রুয়ারি মাসের বেলা বারোটা। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের রেল শহর বিলাসপুর। 'মৃগয়া' হোটেলের তেতলায় ডবল ঘরের দক্ষিণমুখো বড় ঘরখানা এখন ক'দিনের জন্য নয়নসিন্ধুর আস্তানা। তিনি এখানে এসেছেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের নেমন্তন্ন রাখতে।

এই বিলাসপুরের রেল কোম্পানী যখন জঙ্গল কেটে রেল লাইন বসাচ্ছিল—তখন বাঙ্গালী ঠিকাদারদের সঙ্গে সঙ্গে কৃপাসিন্ধুও এসেছিলেন। হয়তো তাঁর তাল-মিছরির ডিস্ট্রিবিউটর খুঁজতে। কিংবা এমনিই ঘুরতে আসা। না হয় কোন তীর্থ-ধর্মের ব্যাপারে। এখানে এসে ক'দিন থেকে গিয়েছিলেন। সেই সুবাদে এখানে কৃপা-সিন্ধু রায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলেন। এসব নয়নসিন্ধুর জন্মের আগের কথা।

সেই চিকিৎসালয় একশো বছরের ওপর চলছে। কৃপাসিন্ধু চালিয়ে এসেছেন। তারপর চালু রেখেছেন নয়নসিন্ধু। ওখানে একশো বছরের ওপর সাধারণ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে এসেছে। রেসিডেন্সি এলাকা টাউন কোতোয়ালি এলাকা—সব জায়গায় মানুষ জন্ম থেকেই এই মৃত্যুঞ্জয় চিকিৎসালয় দেখে আসছে।

কৃপাসিন্ধুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে রাজ্য সরকারের নেমন্তন্নে কৃপাসিন্ধু মার্গ-এর ফলক বসালেন আজ নয়নসিন্ধু। এ জন্যে ভূপাল থেকে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী এসেছিলেন। খুব পরিশ্রম গেছে। এখন খেতে বসবেন নয়নসিন্ধু। খেতে বসার আগে রঘুকে ডাকলেন, হৃষীকেশ কোথায়? ডাকো? আমি একা খেতে বসতে পারিনে—

হৃষীকেশবাবু এলেন বলে। খবর দেওয়া আছে। এই তো এসে গেছেন।

হৃষীকেশকে কখনো কখনো নয়নসিন্ধুর সফরসঙ্গী হতে হয়। গল্পগাছা করার জন্যই হৃষিকেশকে নিয়ে থাকেন। ড্রাইভার, রঘু, দু'জন খিদমদগার নিয়ে নয়নসিন্ধু লম্বা লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে থাকেন। অর্ডারমত হোটেলের লোকজন খবার সাজিয়ে দিয়ে গেছে। সে খাবার দেখে হৃষীকেশের তো চক্ষুস্থির।

ফুলকপি, কড়াইশুঁটির তরকারি, মুড়িঘণ্ট দিয়ে ডাল, তাল,

আলু ভাজা, দু'খানা রুই মাছের গাদা ভাজা—এছাড়া ছোট একটি মুর্গীর স্টু, এক বাটি ক্ষীর, দু'টি কলাকন্দ। প্লেটে আলাদা করে নুন আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো।

করেছেন কি? এতসব খাবেন নাকি? এতো একজন জোয়ান লোক খেয়ে হজম করতে পারবে না।

নয়নসিন্ধু মুখটা কাঁচুমাচু করে বললেন, এই খেয়েই তো আছি হৃষীকেশ। এতেই খিদে যাবে পেটের। বাঁচবো তো?

বড়সাহেবের পেছন থেকে রঘু বলল, কন্সটিটিউশন হৃষীবাবু। বড়সাহেবের কন্সটিটিউশনই আলাদা।

নয়নসিন্ধু ভাত মেখে খেতে খেতে বললেন, ডাক্তার বলেছিল—সকালে দুটো করে ডিম খাবেন। তবে ডিমের সাদাটুকু খাবেন। বোঝো সাদাটুকু হলদেটুকু কি ডাক্তারের বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসবো?

সবটা খেয়ে নিয়েছি। আমার আবার ব্লাডপ্রেসার নিচেরটা গত পঞ্চাশ বছর সেই আশিতে দাঁড়িয়ে আছে। কমেও না, বাড়েও না!

সে তো সবচেয়ে ভাল ব্লাডপ্রেসার শুনেছি।

শুনেছো? তবে খেয়ে যাই—কি বল?

হৃষীকেশ বুঝলো, নয়নসিন্ধু তাকে নিয়ে রসিকতা করছেন। বিছানায় আধখোলা ছড়ানো বইগুলো কি তা জানে সে। নয়নসিন্ধু নিজের দশ বারো বছর বয়সে তার মানে ১৮৯৯-১৯০০ সালে যেসব গল্পের বই পড়েছেন সেগুলোই বহু কষ্টে অক্ষয়বাবু জোগাড় করে এনে দিয়েছেন। সেই সব বই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়েন নয়নসিন্ধু -আর পড়তে পড়তে চলে যান সেই সময়ে। এছাড়া ওই বিছানায় থাক থাক সাজানো রয়েছে—দাসী, বালক, মর্মবাণী। চামড়ার বাঁধাই। ওগুলোর ওপর নয়নসিন্ধু এক এক সময় শুধুই আঙ্গুল বোলান।

খাওয়া শেষ হতেই দু'জন খিদমদগার এসে বড়সাহেবের পায়ের

পাতলা মোজা খুলে নিয়ে গেল। তারপর ভিজে তোয়ালে দিয়ে পায়ের তলা মুছিয়ে দিতে লাগল। শার্ট তুলে পিঠ, নাইকুণ্ডলী, ঘাড় গলা মুছিয়ে দেবার পর নয়নসিন্ধু কয়েকটা পাশ বালিশ দিয়ে বানানো বালিশ দেওয়ালে হেলান দিলেন। আচ্ছা বলতে পারো হৃষীকেশ একটা কথা ?

কি কথা ? এখনো তো বলেননি।

কোন গূঢ় বড় মাপের কথা নয়। খুব সাধারণ কথা।

বলুন।

এত লোকের গাছে লিচু হয়। তারা লিচু পায়। আমি আমাদের সিন্ধু গার্ডেনের কোন লিচু গাছেরই লিচু পাইনি কোনদিন। এরকম হয় কেন ?

এসব কথা কখন মনে হ'ল ?

সকাল থেকেই মনে হচ্ছে হৃষী। বিশেষ করে আমবাগানের সারিতে দক্ষিণ প্যাঁচে ঘুরে এলে প্রথম যে লিচু গাছটা পাবে—ওর কথাই সকাল থেকে মনে হচ্ছে ! গাছটা সব দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। এই শীতে ওর যখন একটা পাতা খসে—তখন ভাবি মাটির নিচে ওর পুরনো শেকড় কি তার টের পায় ?

এসব কথা রঘুর কোনদিনই ভাল লাগে না। কেমন অস্পষ্ট। সে চাঁচা গলায় বলল, এবার আপনি ঝাড়া চল্লিশ মিনিট ঘুমোবেন। আমি ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছি।

হৃষীকেশ উঠে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে নয়নসিন্ধুর পুরোনো শরীরটাকে ঘুমের ভেতর গুঁজে দেবার আয়োজন হচ্ছে। কোথায় সিন্ধু গার্ডেন আর সে গার্ডেনের লিচু গাছ। আর কোথায় বা রেল শহর বিলাসপুরের এই হোটেল ঘরে বড়সাহেবের ঘুমপাড়ানি অন্ধকার আর মৃত্যুঞ্জয় চিকিৎসালয়ের সামনের কৃপাসিন্ধু মার্গ।

এখন তো মানুষটার মা নেই। বাবা নেই। বৌ নেই। আছে ডালপালা। আর আছে তালমিছরির সাম্রাজ্য—যা কিনা নিজের

গতিতেই আপনা আপনি বেড়ে চলেছে। এখান থেকে দেখা যায় না—কিন্তু পৃথিবীর কোন এক জায়গায় পড়ে আছে সিন্ধু গার্ডেন। সেখানে লিচু গাছটার কাণ্ডে, শিকড়ে, ফলে, পাতায়—গাছটার চেয়ে বুড়ো—অনেক বুড়ো মানুষটার মন পড়ে আছে।

॥ নয় ॥

বছর ঘুরে আবার বিশ্বকর্মা পুজো এসে গেল। কৃপাসিন্ধু তালমিছরির প্ল্যাণ্টে বেশ বড় পুজো। প্রসাদ খুব সিম্পল। ডাল ভাত, তরকারি আর মাংস। রাতে অফিসের সামনের গলিতে সিনেমা। কর্মচারিরা সারা ফ্যামিলি নিয়ে পেট পুরে খেয়ে এই দিনটায় সিনেমা দেখে।

কুসুমসিন্ধু ঠিক করেছেন—এই ছুটির ভেতরে অফিস সিফট করবেন নতুন বাড়িতে। বাড়ির কাজ অনেক বাকি। সেখানে একবার নিয়ে ফেলতে পারলে বকেয়া কাজ সব ধীরেসুস্থে তুলে দেওয়া যাবে।

সেইমত সিন্ধু গার্ডেনে ফোন এল। নয়নসিন্ধুর ফোন। বি-বা-দী বাগের অফিস থেকে কুসুমসিন্ধু ফোন করছেন। সিন্ধু গার্ডেনে এখন বেলা এগারটা। গাছে গাছে চারিদিক ছায়া। তার ভেতর দিয়ে পাখিদের ধুলো খেলা—মাটিতে নেমে—আবার সে গাছের কচি পাতার খোঁজে ওদের দল বেঁধে ডালে ওঠা—সবই টের পাচ্ছিলেন নয়নসিন্ধু। কিছুই দেখতে পান না। কানে শোনেন আবছা। তবু সেই আবছা শব্দ ধরে ধরে ব্যাপারগুলো টের পাচ্ছিলেন।

এর ভেতর ফোন। রঘু ধরেছিল।

কুসুমসিন্ধু বললেন, দে—বাবাকে দে।

ফোন কানে দিয়ে নয়নসিন্ধু বললেন, কে গো?

বাবা অফিস সিফট হচ্ছে। তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে বল রঘুকে—

বুঝলাম। রঘুর ঘর!

ওপাশ থেকে কুসুমসিন্ধুর গলা ভেসে এল, পাগল হয়েছো বাবা। এক স্কোয়ার ফুট যেখানে একুশশো টাকা-সেখানে আবার রঘুর ঘর কি? নাও নাও সব জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নাও। একদিনে এতবড় অফিস সিফট করা কি সোজা কথা বাবা।

একসঙ্গে অনেক কথা মনে আসছিল নয়নসিন্ধুর। যেমন—অফিসটা এত বড় করলো কে? কিন্তু কিছুই না বলে নয়নসিন্ধু ফোন নামিয়ে রাখলেন।

কাছাকাছি মুখিয়েই ছিল রঘু। সে জানতে চাইলো, কি হল বড়সাহেব?

আস্তে আস্তে দু'পাশে মাথা নাড়লেন। তারপর খুবই চাপা গলায় বললেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে বাবা যেদিন ফেল হলেন—না জানি কী তাঁর মনের অবস্থা হয়েছিল।

আপনি কথা তুললেই—হয় বিদ্যাসাগর না হয় বঙ্কিম—তার নিচে নামতে পারেন না।

অস্থির হচ্ছে কেন রঘু? ও বাড়ি যদি আমি যাই তো তুমি যাবে।

আপনার নিজের হাতে বড় করা কোম্পানি—আপনি তো যাবেনই। আপনি যাবেন না কেন?

আর ইচ্ছে হয় না রঘু। এখন ছোটবেলার মত ঘাসে শুয়ে শুয়ে শুধু আকাশ দেখতে ইচ্ছে যায়।

বড়লোকের অমন নানান ইচ্ছে হয়।

আমায় শুধু বড়লোকই দেখলে রঘু। আমারও মন খারাপ হয়—কান্না পায়, এসব কাকে বলবো? কেউ তো নেই আর। কুসুমের মা থাকলে তবু দু'-একটা কথা বলতাম।

মন খারাপ করবেন না। ওতে আপনার শরীর খারাপ হয় বড়সাহেব।

বাঃ! আমি কি সিন্দুক? আমার ভেতর কিছু ঢুকতে পারবে না?

মন খারাপ কেন?

তা জানি না রঘু। বড্ড খারাপ লাগে। পারো যদি আমায় একটু ১৯১৬-য় নিয়ে যাবে?

যাবেন? বেশ তো—চলুন।

তাহলে হৃষীকে একটা খবর দাও।

ইংরাজি ১৯১৬ সনে নয়নসিন্ধুর বয়স ছিল ছাব্বিশ। তখন দেশবন্ধু আশুতোষ এঁরা সব তাঁদের মধ্যগগনে। আলিপুর বম্ব কেসের পর অরবিন্দ চলে গেছেন পণ্ডিচেরি। ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কৃপাসিন্ধু তালমিছরি বাঙ্গালীর গেরস্থ ঘরে একটা অতি পরিচিত নাম হয়ে উঠছে। নোবেল প্রাইজ পেয়ে ইস্তক রবিবাবু দেশবিদেশে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তখন ছ'বছর হ'ল সত্যবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কৃপাসিন্ধু তালমিছরি থেকে তখন তার জন্যে ট্রামের একখানা অল সেকসন মান্থলি টিকিট বরাদ্দ হয়েছে।

গ্যারেজ থেকে লেদ মেসিন শপ সব জায়গাতেই বিশ্বকর্মা পুজো বলে মাইক বাজছে। কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় মোট সারাই সিন্ধু গার্ডেন থেকে নয়নসিন্ধু চলেছেন ১৯১৬য়। গাড়ির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে পাখির মত পা দুখানা সামনের সিটের কাঁধে তুলে দিলেন নয়নসিন্ধু। মাথার ডান পাশে হৃষীকেশ। সামনে ড্রাইভারের কাছে সদ্য কেনা কয়েকখানা ছোটদের বই। পাশে রঘু। তারই কথায় গাড়ি এক এক জায়গায় থামছে। রঘু স্টেশনারি দোকান থেকে কি সব কিনে প্যাকেট করে আবার গাড়িতে ফিরে আসছে।

শেষমেষ গাড়ি এসে থামল রডন স্ট্রিটে। দু'পাশে দুটো হাইরাজ বাড়ি উঠছে। বারো চোদ্দতলা এক-একটা। তাদের মাঝখানে একটি দোতলা বাড়ি, দুই তলাতেই টালির ছাদ লাগানো বাংলো প্যাটার্নের বারান্দা। জানলা-দরজা ঢাউস। বাড়ির সামনে আগাছার ভেতর একটা বুড়ো অষ্টাবক্র আম গাছ—যাকে দেখলেই বোঝা যায় অযত্নে, বয়সের ভারে গাছটা বহুকাল হ'ল আর আম দেয় না।

বারান্দায় উঠে হৃষিকেশের চোখ গেল দরজার পাশের দেওয়ালে। সেখানে ধুলো-কালি মাখানো পাথরে খোদাই করে লেখা—লেফটেনাণ্ট কৃষ্ণকমল দত্ত, অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এমপায়ার।

সেদিকে তাকিয়ে নয়নসিন্ধু উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আমার বন্ধু কেষ্ট ফ্রান্সে রনিমেডের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মানদের গ্যাসে মারা যায়। মরবার আগে অব্দি ষোল ঘণ্টা একা ট্রেঞ্চও ছাড়ে নি। দু'জনই টাউন স্কুলে রসময়বাবু ছাত্র ছিলাম।

কড়া নাড়তে হ'ল না। আপনা আপনি দরজা খুলে দুই মহিলা দাঁড়িয়ে। ভেতরে এস।

তোরা কেমন আছিস দেখতে এলান।

ভেতরে আসবে তো! এসো।

ভেতরে ঢুকে হৃষিকেশ অবাক হয়ে গেল। চেয়ার, টেবিল, ডিভান, আলো—সবই অন্য রকমের ডিভানটা শুয়ে শুয়ে পা ছড়িয়ে দেবার। তাতেই বসলেন নয়নসিন্ধু। হেলান দিয়ে বললেন, আজ তোবা কি খাবি? রঘু কি এনেছে জানি না।

রঘু দু'টি প্যাকেট খুলে দিল। একটায় বড় কেক। অন্যটায় পুরো এক শিশি আচার।

মহিলাদের একজন বছর পঁয়তাল্লিশ। অন্যজন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। মুখ ভর্তি পাউডার দু'জনেরই। ঠোঁট টকটকে লাল। গায়ে লতাপাতা আঁকা জংলা শাড়ি। দু'জনই চুল টান টান করে বেঁধে জোড়া বেণী করেছে।

আচারের শিশি দেখে ছোটজন রঘুর হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিল। নিয়ে বলল, দাদু ঠিক জানে আমি কোন্‌টি ভালবাসি। বড়জনের দিকে তাকিয়ে নয়নসিন্ধু বললেন, বললেন, কি বড়কি—কেক নিবি নে—

জানি। কেক নিলে এখন তোমায় চা করে দিতে হবে তা দিচ্ছি।

তা না হয় দিলিই। আমি তো তোদের ঠাকুর্দার বন্ধু ওই দ্যাখ ছবি থেকে তাকিয়ে হাসছে।

সত্যিই লেফটেনাণ্ট কৃষ্ণকমল দত্ত বিশাল একখানা ছবি থেকে এদিকে তাকিয়ে আছে। কোমরে তরোয়াল। মাথায় চোখ অব্দি টেনে নামানো টুপি বুকে মেডেল।

ছোটজন বলল ঠাকুর্দাকে আমরা দেখিনি। আমার জন্মের পর মা মারা যেতেই বাবা সেই যে গেলেন ইউরোপে তারপর থেকে তুমিই আমাদের দেখাশোন করছো দাদু।

ভুল বকছিস ছুটকি। আমি দেখবো কি? দেখছে তোদের ঠাকুর্দার টাকা। ঠাকুর্দার বাড়ি। ঠাকুর্দার মিলিটারি পেনশন। তাও তোর তোদের বিয়ে দিতে পারিনি।

বড়কি, ছুটকি একসঙ্গে বলে উঠল, বিয়ে না হয়েছে দাদু ভালই হয়েছে। এই বেশ হয়েছে। দ্যাখো না ঠাকুর্দার ভাইদের অন্য নাতি-নাতনীরা বসতবাড়ি, মোটা টাকা পেয়ে বেচে দিয়ে উঠে গেল। সেখানে এখন পেল্লায় সব বাড়ি উঠেছে।

তোরা বেচিসনি তো।

না।

বেশ করেছিস।

সন্ধের মুখে সিলিং থেকে ঝোলানো ঝড়ের ভেতর লুকানো ডুম জ্বলে উঠলো। দক্ষিণের দেয়াল জুড়ে লাস্ট সাপারের একখানা প্রিন্ট কাচ দিয়ে বাঁধানো। সিলিং সেই ফুট পনের

উঁচুতে দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ি তলপেটটা সাদা গাঢ় রং-এ পালিশ করনো। ঘরের কোণে হ্যাট স্ট্যান্ড।

আর এসবের মধ্যে দাঁড়ানো কেষ্টর দুই অবিবাহিতা নাতনী। বড়কি আর ছুটকি। ওদের দু'খানা মুখই পাউডারে সাদা। ঠোঁট রাঙ্গানো। কাজ করা পুতুলের মতই হাসি হাসি দু'খানা মুখ ট্যাপটোপা—গলার স্বর অব্দি অন্য রকম। ওরা একই সঙ্গে বলে উঠলো, দাদু আজ তুমি অনেকদিন পরে এসছো। ঠাকুর্দা-ঠাকুমার গল্প শুনবো আমরা। চা করে আনি।

চা এলে নয়নসিন্ধু শুরু করলেন, কেষ্ট তো মারা গেল ফ্রান্সের রানিমেডে। অনেকে বলে রুনিমেড। এদিকে তোমরা ঠাকুরমার তখন বড়জোর কুড়ি বছর বয়স। পরমা সুন্দরু। কোলে তোদের বাবা। সে বেচারা জানেই না তার বাবা বিদেশে যুদ্ধের মাঠে মারা গেছে।

ঠাকুরমাকে দেখতে কেমন ছিল?

দুর্গা প্রতিমার মত। বড় বড় চোখ। আমায় দাদা বলে ডাকতো। বেশিদিন বাঁচলো না। তোদের স্কুলে উঁচু ক্লাসে উঠতে না উঠতেই মাতৃহীন হয়। আমি ডাকতাম বৌঠান বলে।

তোমার বন্ধু কেষ্টার গল্প বল। তোমার বৌঠানের গল্প বল। পারলে আমাদের মা-বাবার গল্পও বল।

তোমাদের মা-বাবার গল্প তো আমি বিশেষ জানি না, যদিও তোদের বাবার বিয়েতে আমিই বরকর্তা ছিলাম। কেন যে অভয় বিলেতে চলে গেল তা আজও জানি না। শুনেছি তোদের মায়ের মৃত্যুর পর ওর এখানে কিছুই ভাল লাগছে না। আমাদের তাল-মিছরিতে জয়েন করতে বললাম। রাজি হ'ল না ও।

থাকগে ওসব কথা দাদু কেমন ছিলেন।

কেষ্ট? খুব হাসিখুশি স্কুলে আমাদের সবাইকে হাসাতো। বি এসসি পাশ দিয়ে ও যে গোপনে পল্টনে নাম লেখাবে আমরা কেউ

ভাবতে পারিনি। খিদিরপুর থেকে যেদিন জাহাজে মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে রওনা হ'ল—সেদিন জাহাজঘটায় আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

তোমরা দু'জনে খুব বন্ধু ছিলে?

হরিহর আত্মা। আমি ছিলাম নরম ও শক্ত। স্কুলে থাকতেই ও ঘুঁষোঘুঁষি খেলতো। বীরত্বের জন্যে কৃষ্ণকমল সব কিছু করতে পারতো। আমার আগে বিয়ে হয়। ওর বিয়েতে আমার স্ত্রী এয়োস্ত্রী ছিল। সারারাত আমরা দু'জনে বাসর জেগেছিলাম। হৈ-হল্লা করে কত গান গাইলাম আমি।

আজ একটা গান শোনাবে দাদু?

না রে। গলা নেই। গাইলে বুক কাঁপে আজকাল।

তাহলে থাক। দাদু বেঁচে থাকলে কত বয়স হ'ত?

আমরা একবয়সী। কেষ্টার এখন সাতানব্বই পার হয়ে যেতো—বলতে বলতে হঠাৎ পাশে তাকিয়ে নয়নাসিন্ধু বলছেন, কি হৃষীকেশ কেমন লাগছে?

চমৎকার।

তাহলে একটা ঘটনা বলি। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে কেষ্টার খুব নাম হয়েছিল। স্বয়ং ব্রিটিশ সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ট্রেঞ্চের ভেতর নেমে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেন। সে ছবি কাগজে বেরিয়েছিল। সেই ছাপা ছবি নিয়ে কলকাতায় কী তুলকালাম কাণ্ড! স্কুলে গিয়ে রসময়বাবুকে সে ছবি দেখাতেই তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

এই নাও চা। কেক ডুবিয়ে খাও।

সারা ব্রিটিশ এম্পায়ারের ভেতর তখন আমাদের বুক ফুলে এতখানি। কৃষ্ণকমলের ডেথ নিউজ কলকাতায় এসে পৌঁছলে আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায় দু' দিন। আমি বৌঠানকে সাহস দিই সরকারি খরচায় নার্সিং পড়ার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন বড়লট বাহাদুর। তা বৌঠান নেন নি। তিনি তখন শোকে অধীর।

সেই সময় থেকেই উপোস দিয়ে দিয়ে রাজরোগটি বাধান। অভয় যখন থার্ড ক্লাসে—তখন রক্ত উঠে বৌঠান মারা গেলেন। অভয় ছিল হস্টেলে। সেই থেকেই তোদের বাবা একা একা। মনের কথা কাউকে বলতো না। বড়জোর অমার বড়কে দু'-একটা কথা বলতো। আর কাউকে না।

'বড়কি আর ছুটকি পঁয়তাল্লিশ বছরের দুই কুমারী। তারা দু'জনই নয়নসিন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলছে। এই মানুষটি তাদের পুরুষের অভিভাবক।

হৃষীকেশ দেখল—অনেকদিন পরে মহাতৃপ্তিতে হাসতে হাসতে চায়ে কেক ডোবাচ্ছেন নয়নসিন্ধু। মুখে চিন্তার কোন রেখা নেই। রেখা যা—তা বয়সের। চামড়া টিসু পোপের মত ফিনফিনে। শতাব্দীর বয়সী। রগড়ালেই বুঝি কুঁচকে যাবে। কিংবা ছিঁড়েও যেতে পারে।

মানুষের শরীর এত পলকা। অথচ সেই শরীরের ভেতর কত গল্প কত সুখ—কত দুঃখ। সেই শরীরের গোঁফে, চুলে ভ্রূতে নয়নসিন্ধুকে আবার রং দিতে হয়। নয়তো যে একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ো দেখাবে তাকে।

কথা বলতে বলতে নয়নসিন্ধু ঝুঁকে পড়ে বড়কি আর ছুটকিকে দেখলেন। দেখে বললেন, হ্যাঁ রে তোরা কেমন সেজেছিস?

কেন দাদু? যেমন সেজে থাকি—তেমন সেজেছি।

সে কেমন রে?

মায়ের একখানা ছবি ছিল। আর নেই তা। ঠাকুমার একখানা ছবি ছিল। আর তা নেই তা। সেই সব ছবির ধাঁচে দাদু—যেমন এই জোড়া বেশি, আঁচল ফিরে শাড়িপরা—সবই বজাই করে রাখি আমরা। সেই সব ছবির মতই সাজি আমরা। বাইরে তো কোন-দিন বেরোইনি। শাড়ি দু'খনো সেই আমলের।

মা-ঠাকুমার প্যাঁটরা ঘেঁটে। আচ্ছা দাদু—সেই যে তোমরা ঠাকুমার খারাপ খবর পেলে—তখনকার এই কলকাতা কেমন ছিল?

সব কি দিদিভাই মনে আছে। তবে আমরা আমি আর কেষ্টা ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ির সবার সঙ্গে গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল থিয়েটার দেখতে গেছি। তখন বুড়ো হয়ে গেছেন। দম রাখতে পারেন না। একটা ডায়ালগ দিয়ে হাঁপাতে থাকেন। দানীবাবুকে আমরা উঠতে দেখেছি। শিশিরবাবুকে মনে হয়—এই তো সেদিনের কলকাতায় তখন মোটমাট বারোখানা মোটর গাড়ি—সে তুলনায় ঘোড়ার গাড়ি হাজার কয়েক।

। দশ ।

সিন্ধু গার্ডেনের এই বাড়িটা একেবারে তৈরি হয়নি।

কৃপাসিন্ধুর তালমিছরি যেমন রড় হয়েছে—বাড়িটাও তেমন তৈরি হয়েছে। সত্যবতী এই বাড়িটাকে একটু একটু করে বড় করেন। কিন্তু কুসুমে বড়কে সব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। কারণ, কাউকে তিনি তেমন পাননি কাছে। এ বাড়ির সুলুক-সন্ধান সবই তিনি জানতেন।

আর এখন তা জানেন মাত্র দুজন। একজন নয়নসিন্ধু নিজে আর অন্যজন কুসুমসিন্ধু। বাধানো থাক থাক পাঞ্চ আয় স্ট্যান্ড ম্যাগাজিনে বোঝাই বইয়ের র‍্যাকটা। ছাড়ালেই বাড়ির পেছন দিকে আবার একটা বড় ঘর। আগাগোড়া কাঠের প্যালেন মেঝে থেকে মানুষপ্রণাম দেওয়াল ধরে ওঠে গেছে। মেঝেতে লাইনোলিয়াম। এ ঘরখানার দেওয়াল চল্লিশ ইঞ্চি। সেই দেওয়ালের গা কেটে জং তাড়ানো টিনের বক্স বসানো থাক থাক। সেই সব বাক্সে টিনের দেরাজ। তাতে পাউডার ছড়ানো পাছে পোকামাকড় আসে।

বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। বারান্দায় বসে সিন্ধু গার্ডেনের গাছপালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন নয়নসিন্ধু এতক্ষণ। অশ্বিনের আজ কত তারিখ? মনেও পড়ল না সকালবেলা এখন এখানে বড়

বড় গাছের নিচে বড় বড় ছায়া। ছায়াদের ফাঁকে-ফোকরেই রোদকে এখানে দেখা যায়।

ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে মনের ভেতরে ভেসে আসা ছবিগুলোকে নয়নসিন্ধু যেন ওইসব গাছতলার ছায়ায় থিয়েটারের রিহার্সেলের মতই অভিনয় হতে দেখতে থাকলেন।

পুরনো বাড়ির উঠোনো প্রাইভেট টিউটার এসে মাদুর বিছিয়ে বসলেন। সন্ধেতও। হেরিকেন নিয়ে পড়ুয়া নয়নসিন্ধু বই হাতে পড়তে বসলেন। কী একটা বানান ভুল হইতেই প্রাইভেট টিউটরের বিরাশি শিকার থাপ্পড় পড়ল। বৌদিরা ছুটে এসে নয়নকে নিয়ে গেলেন। কানের নিচে ঠাণ্ডা জলের সেঁক নিয়ে নয়ন আবার এসে পড়তে সবসলো।

স্কুলে রসময় মাষ্টারমশাই ফেল করিয়ে দিয়েছে। তিনি আর ফ্রেণ্ড কৃষ্ণকমল পাখোয়াজ বাজিয়ে কীর্তন গাইছেন। রসময় মাষ্টারের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

চৌরঙ্গির সাহেবি ওষুধের দোকানে যুবক নয়নসিন্ধু তাল-মিছরির গুণাগুণ বুঝিয়ে বলছে। সাহেব ডাক্তার মন দিয়ে শুনে বললেন, গিভ মি ফিউ স্যাম্পেল।

এখনকার নতুন বাড়ির গাঁথনির কাজ চলছে। তদারকি করছেন এক মহিলা। হাতে ছাতা। আকাশে ঝাঁঝালো রোদ। ছাতার ফাঁক দিয়ে মহিলার মুখ দেখা গেল। এ যে সত্যবতী। নয়নসিন্ধুর সহধর্মিণী।

এবার নয়নসিন্ধু টের পেলেন। এত বড় বাড়ির ফাঁকা বারন্দায় বসে বসে বসে তিনি একা একা কাঁদলেন। পাশে কেউ নেই যে— তুলো দিয়ে তাঁর ভিজে গালটাকে রুট করে দিতে বলবেন।

ছড়ি ভার দিয়ে তিনি বড় ঘরে ঢুকলেন। তারপর স্ট্রাণ্ড আর পাঞ্চ ম্যাগাজিন বোঝাই পাল্লাটা আস্তে সরিয়ে তার পেছনের সেই লুকোনো ঘরখানায় ঢুকে পড়লেন নয়নসিন্ধু।

এ ঘরে পাইপ দিয়ে পাশের ঘর থেকে সব সময় বাতাস ঢোকে। বাইরের বইয়ের পাল্লা সরিয়ে এঘরে ঢুকতে গেলেই আপনা-আপনি নিওন আলো জ্বলে ওঠে।

ঘরখানা বাইরের তুলনায় ঠাণ্ডা। কোন শব্দ ঢোকে না এখানে। নয়নসিন্ধু একেবারে সামনের দেরাজটা টানলেন। এটা বোধহয় সন ইংরাজী উনিশশো তেতাল্লিশের দেরাজ। ভেতরে তাকালেন তিনি। যুদ্ধের সমমকার একশো টাকার নোটের থাক। লাট দিয়ে সাজানো।

ঝুঁকে পড়ে পাশের দেরাজটা টানলেন। এখানে সন ইংরাজী উনিশশো সাঁইত্রিশ শুয়ে আছে। চার দেওয়াল জুড়ে দেরাজের পর দেরাজ। উনিশশো সতের থেকে হালের সাল অব্দি আলাদা আলাদা দেরাজ। এসব দেরাজের কথা অলকাসিন্ধু এখনো জানে তাকে তা একদিন জানাবে তারই বাবা কুসুমসিন্ধু। তখন অলক-সিন্ধুকে দাদুভাই বলে ডাকার জন্যে এই দুনিয়ায় নয়নসিন্ধু থাকবেন না। এই ব্যবস্থাই নিজের ছেলের সঙ্গে মন্ত্রগুপ্তির মত স্থির হয়ে নয়নসিন্ধুর।

সন ইংরাজী উনিশশো বিয়াল্লিশের আগেকার দেরাজগুলো অবরে-সবরে খোলা হয়। তখনকার একশো টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নিয়েছে সরকার। ওসব নোট বাজারে ছাড়লে সবাই তাকিয়ে থাকবে। তাই ব্যবস্থাটা কিছু অন্যরকম।

ইণ্ডিয়া তখন স্বাধীন হচ্ছিল—যখন এইসব একশো টাকার নোট নয়নসিন্ধু বড়বাজারে তেতাল্লিশ টাকা বাটা দিয়ে ভাঙাচ্ছিলেন। একশো টাকার নোট দিয়ে সাতান্ন টাকা পেতেন। পরে জেনেছেন—তুলোর ফরওয়ার্ড কারবারিরা সেসব নোট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে জমা দিয়ে একশো টাকায় একশো টাকাই পেতো। এই নোট কিনে নিয়ে বড়বাজারের একটা দিক রাতারাতি বড় হয়ে যায়। মহাযুদ্ধ থেমে যাওয়ার দু' বছরের মাথায় সাধারণ লোকের অনেকের হাতেই এই

একশো টাকার নোট ছিল। যারা ভাঙাতে পারেননি—তাদেরটা বাতিল হয়ে গেছে। সবাই তো ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে জমা দিয়ে ভাঙ্গাতে পারে না। সবাই ফরওয়ার্ড কারবারিও নয়।

টাকার সমাধা ভারি অদ্ভুত লাগে নয়নসিন্ধুর। একশো টাকার শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে নোট হাতে বসে থাকায় কেউ হ'ল ফকির, আর বড়বাজারের কিছু ফকির বাটায় কিনে সেইসব শ'টাকার নোটে শ'টাকাই পেল। দুনিয়ার বাজারে যাদের তুলোর কারবারে ছিল তারা আর কি।

দেরি হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু নোট নয়নসিন্ধু তখন ভাঙ্গাতে পারেননি। কৃপাসিন্ধুকে এসব উটকো ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

নয়নসিন্ধু আর তাঁর মত কিছু কারবারী—যাদের সঙ্গে কৃপাসিন্ধু তাল-মিছরির নিয়মিত লেনদেন আছে—নিজেদের ভেতর একটা আপসরফা করে নিয়েছেন। এ ও'র জিনিস কিনলে ওই নোটে লেনদেন হয়। পাঁচ-ছ'ঘর কারবারির ভেতর এই একই নোট বরাবর হাতবদল হচ্ছে। বাজারে বাতিল ওই কারেন্সি নোট ও'দের নিজেদের ভেতর চালু রেখেছেন ও'রা। ফলে মূলধনের টান পড়ার ভয় নেই। টাকাটাও জলে গেল না। কাজটাও দিব্যি হয়ে যাচ্ছে।

নানা সালসনের রকমারি নোটের কয়েক কোটি টাকার গাদির ভেতর খানিকক্ষণের জন্য তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন নয়নসিন্ধু। পাল্লা সরাবার একটা সামান্য ক্যাঁচ শব্দে তটস্থ নয়নসিন্ধু 'কে?' বলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

দিনের বেলায় এখানে ঢুকছো কেন?

ওঃ! তুমি—তা বেশ। কিন্তু আমার খোঁজে এত ভেতরে কেন?

এ কথায় কুসুমসিন্ধু ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। এ কোন্ নয়নসিন্ধু? এ'কে তো সে চেনে না। তার বাবা নয়নসিন্ধু চিরকালই পুত্রগতপ্রাণ। পর পর দু'দিন কথা না বললে নয়নসিন্ধু তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবেন। আর বলবেন ও কুসুম? বাবা! আমি

আবার কী দোষ করলাম বেশি বয়সে যে আমার সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিলি? পারিনে বাবা, তুই যে আমার একটাই ছেলে আমি তো তোর সঙ্গে কথা না বলে থাকতে আর আমার কেউ নেই—

আর এখন কুসুমসিন্ধু দেখলেন, তাঁর বাবার চোখের ঘোলা দৃষ্টিতে একটা অপরিচয় এসে থানা গেড়েছে। মাথার ওপর থেকে কয়েক গোছা চুল কপালে। সরু পাতলা ঠোঁটে ওপরের পাটির দুটি বাঁধানো দাঁত যেন চেপে বসলো।

কেন? তোমার খোঁজ নিতে এখানে আসা আমার বারণ?

কোন বারণ নেই। কিন্তু শুধু শুধু আর কেন বাবা বলে ডাকো আমায়।

তুমি আমার বাবা, তাই বাবা বলে ডাকি। এবার বলতো—দিনের বেলায় এখানে ঢুকছো কেন?

আমার কিবা দিন কিবা রাত। দ্যাখো আমরা দু'জন আলাদা মানুষ: এই যা-কিছু দেখছো—এই সবই আমার আয় করা। এই টাকা কৃপাসিন্ধু মিছরির খোলা খাতায় দেখানো অসম্ভব।

এত পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে আসল কথা বলে ফেল বাবা—

দরকার আছে। কারণ, এইসব টাকাই আমারই বুদ্ধিবলে কৃপাসিন্ধু মিছরি আয় করেছিল।

জানি। তখন আমার বয়স হয়নি। তুমিই সব দেখতে বাবা।

বাবা কথাটা জ্বলন্ত গোলা হয়ে নয়নসিন্ধুর বুকে গিয়ে সিধে বসে যাচ্ছিল। সে চিড়বিড় করে বলে উঠলো, এত বাবা ডাকার দরকার দেখি না।

আমারও বয়স হয়েছে বাবা। আমাকেও একদিন ছেলের মুখোমুখি এ ঘরে এসে দাঁড়াতে হবে। বাবাকে তো আর দাদা ডাকতে পারি না।

তখন তাকে বোলো—এইসব টাকা তোমার বাবার একার উপার্জিত।

তা তো বোঝা গেল। কিন্তু এতগুলো বাতিল টাকার ভেতর বসে কী সুখ পাচ্ছো ?

যে কথা বলছিলাম, আমি আর তোমার বাবাও নই— দাদাও নই। আমরা দু'জন আলাদা মানুষ। সংসার করতে গিয়ে আমি তোমার বাবা। তুমি আমার ছেলে। তোমার বাল্যকাই কবেই কেটে গেছে। আমি সাধারণ মানুষের তুলনায় দেড়গুণ বেশি বেঁচে বসে আছি।

তা তো বুঝলমে। এসবই আমার জানা বাবা। তুমি আর রঘু মিলে নতুন বাড়িতে তোমার চেয়ারপত্তর নিতে দাওনি।

ওই চেয়ার ক'খানাই আছে আছে আমার। আর কি আছে।

কেন, তোমার রঘুপতি বাহন আছে বাবা। তার কথায় উঠছো বসছো।

দ্যাখো কুসুমসিন্ধু। এই কৃপাসিন্ধু তালমিছরি আমার হাতে উঠছে। আমি কারও কথায় উঠি না বসি না। তুমি আমার চোখের মণি। তুমি আমার দিক থেকে শুধুই আদর, ভালবাসা, সিকি-উরিটি সব পেয়ে এসেছো। পেতে পেতে এমনই অভ্যস্ত হয়েছ— আমি যে একটা মানুষ, আমি যে তোমার বাবা, আমিই যে কৃপাসিন্ধু তালমিছরিকে ঘরে ঘরে পেঁছে দিলাম—একথা তুমি একদম ভুলে বসে আছো।

কার ওপর অভিমান করছো বাবা। আমার এখন পঁয়ষট্টি, ব্লাড সুগার প্রায় চারশো। হয়তো তোমার আগেই আমি চলে যাবো।

কার ডাক কখন পড়ে কেউ আগাম বলতে পারে না। তুমি প্রৌঢ় হয়েছো। তুমি নিশ্চয় জানো এখন আর তোমার আগের মত সম্পর্কগুলো টান ভালবাসা জোরালো লাগে না। জীবনে এমন কিছু নেই যা তুমি পাওনি। ছেলেবেলা থেকে সবই আমি তোমাকে দিয়েছি। এমনকি ব্যবসা বড় করে তোলার ধাক্কাও তোমার গায়ে লাগতে দিইনি। এখন যদি কেউ আগে যায় তো কারও বিশেষ বাজবে না।

বাড়ির বাইরে আলাদা করে বানানো ঘর। গাছ-পালা দিয়ে বাইরে থেকে ঢাকা। অথচ বাড়ির ভেতর থেকে একখানা আলমারি পাল্লাসুদ্ধ সরিয়ে দিলেই এ ঘরে চলে আসা যায়। পাল্লাটা শুধু ভেতর থেকে শক্ত করে টান দেওয়া। এখানে এই ঘরে কৃপাসিন্ধু মিছরির কাঁচা মালের মূলধন দেরাজে দেরাজে থাক থাক শুয়ে আছে। চলে যাওয়া সময়ের সচল টাকা—যা কিনা আজ বাতিল, তা এই ঘরে মানুষের হাতের আঙুলের নাড়াচাড়ায় সচল হয়ে ওঠে। কয়েকঘর কারবারির ভেতরে এই টাকা এখন লক্ষ্মী। হয়তো এদের দাম পুরনো কাগজের চেয়ে বেশি হয়।

কুসুমসিন্ধু নয়নসিন্ধুকে ঘরের একমাত্র চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে ধরে ধরে বসিয়ে দিলেন। নয়ন কোন আপত্তি করলেন না। তিনি বসলে তবে কুসুমসিন্ধু ঘরের একমাত্র টুলটা টেনে বসলেন। মেঝেতে লাইনোলিয়ম। দেওয়ালে ড্যাম্প আটকানোর দামী রং। দেরাজগুলো সাঙ্কেতিক নম্বরের নম্বরে চেনা যায়। যে নম্বরগুলো তামার পাতে খোদাই করে কুসুমসিন্ধু আর নয়নসিন্ধুর গলার জপের মালার বড় লকেটের পেটে আলাদা আলাদা করে ভরে দেওয়া আছে।

টুলে বসে কুসুমসিন্ধু বললেন—আমারও সব সম্পর্ক বেশ কিছুকাল আলগা লাগে বাবা। এই যে আমার ছেলে তোমার বড়মা সবই কেমন আলাদা হয়ে গেছে অনেকদিন। আমার সঙ্গে কোন যোগই নেই তাদের।

কানে এসেছিল দাদুভাই একটি মেয়েকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

তুমি জানলে কি করে বাবা?

তুমি তো জানো কুসুম এই কৃপাসিন্ধু মিছরির পুরনো ড্রাই ভারেরা প্রায় সবই আমার হাত থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে।

ওরা তোমায় খবরাখবর দেয় আমি জানি। তা তুমি চিন্তা করো না বাবা।

আমিই তো চিন্তা করবো কুসুমসিন্ধু। তোমার বয়স হয়েছে। তোমার ছেলে কী করলো না করলো তা আমি ভাববো না।

নিশ্চয় ভাববে। কিন্তু আমি তো তোমারই ছেলে। যা করার তাই করেছিলাম।

কি করেছিলে?

মেয়েটির আবার বিয়ে দিলাম। আমি তোমার বৌমা মিলে মহা ধুমধামে পাত্র জোগাড় করে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

ও বিয়ে টিকবে না।

তুমি জানলে কি করে? সত্যিই ভেঙ্গে গেছে।

ও মেসে দাদুভাইয়ের কাছে আবার ফিরে আসবে কুসুম।

তাহলে কি করবো বাবা?

নাতবৌকে অফিসে এনে বসাও। দাদুভাই তাহলে নজরে থাকবে।

তুমি এসে অফিসে বোসো। তোমার অফিস বাবা।

না। আমার অফিস নয়। আমি যে-কোনদিন মরে যাবো। এখন অফিস অফিস করে আমার নাচানাচি মানায় না। আমি বাতিল। আমাকে এই বাতিল নোটগুলোর সঙ্গে থাকতে দাও।

তা হয় না বাবা। তুমি বাতিল নও।

আমি বাতিল কুসুমসিন্ধু।

তোমায় ছাড়া হবে না বাবা। এই যে নতুন বাড়ি উঠলো—তার টাকা তোমার সিন্ধু গার্ডেন মর্টগেজ করে তবে ব্যাঙ্ক থেকে এসেছে।

জানি। টাকা হলে ছাড়িয়ে নেবে।

সবই হবে বাবা। তোমায় মাঝখানে থাকতে হবে সব কিছুর।

আমায় বাদ দাও কুসুম। আমি এখন পুরনো নোটগুলো

দেখবো। নেড়েচেড়ে দেখা হয়নি অনেকদিন। ওই স্প্রেয়ারটা দাও তো।

কি করবে?

অনেকদিন গ্যামাকসিন স্প্রে করা হয়নি। পোকা না লাগে শেষে। আমার অনেক কষ্টের আয়।

কুসুমসিন্ধু কথা বাড়ালেন না। নিচু হয়ে স্প্রেয়ারটা তুলে নয়নসিন্ধুর হাতে দিলেন। হাতে পেয়ে নয়নসিন্ধু তাঁর বুকের কাছাকাছি দেরাজটা টেনে খুললেন। তারপর আন্দাজে দেরাজের খোলা মুখে স্প্রে করতে লাগলেন।

কুসুমসিন্ধু দেখলেন, তাঁর বাবার হাত স্প্রে করতে গিয়ে কাঁপছে। অশক্ত কাঁপা হাতের চাপে স্প্রে মেশিনের নল থেকে গ্যামাকসিন ছড়িয়ে পড়ছিল। এলোমেলো ভাবে খানিক দেরাজে পড়ছে। থাক থাক নোটের বান্ডিলের ওপর। কিছু পড়ছে মেঝেয় নীল লাইনোলিয়াম সাদা গ্যামাকসিনের গুঁড়ো।